POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدۡ کَفَرَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ ثَالِثُ ثَلٰثَۃٍ ۘ وَمَا مِنۡ اِلٰہٍ اِلَّاۤ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ یَنۡتَہُوۡا عَمَّا یَقُوۡلُوۡنَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 48-49

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 28 Nov- 5 Dec2024 25 জামাদি আল আওয়াল-২ জামাদিউস সানি-1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

রাত্রিকালে দাফনকার্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ান তাকে দফন করার এক রাত্রি পর। তিনি (সা.) এবং সাহাবারা দাঁড়ান এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কার কবর?' লোকেরা বলল: অমুক ব্যক্তির কবর, কাল রাত্রিতে দফন করা হয়েছিল। তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদনী ওলীউল্লাহ্‌ শাহ (রা.) বলেন: হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনার ভিত্তিতে যা ইবনে হাব্বান উদ্ধৃত করেছেন, অনেকে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে রাতে দাফন করা নিষেধ। ইবনে হুব্বান এর রেওয়ায়েত এর শব্দগুলি

اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ زَجَرَاَنۡ یُّقۡبَرَ رَجُلٌ لَیۡلًا اِلَّا اَنۡ یُّضۡطَرَّ اِلٰی ذٰلِکَ (فتح الباری جزء3 صفحہ 265)

অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) রাত্রে দাফন করতে নিষেধ করেছেন, যদি না একান্ত বাধ্যবাধ্যকতা না থাকে। কিছু ফিকাহবিদগণ এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন যে রাত্রিকালে দাফনকার্য নিষিদ্ধ। এই ফতোয়াটির অপনোদন করতে ৬৯ অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও (রহ.) এক ব্যক্তির রাতে দফন করার বিষয়ে একটি রেওয়াত উদ্ধৃত করেছেন। সেখানেও এই উল্লেখ রয়েছে যে নবী (সা.) এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন–

اِذَا کَفَّنَ اَحَدُکُمۡ اَخَاہُ فَلۡیُحۡسِنۡ کَفۡنَہٗ

তোমাদের মধ্য হতে কারো কাঁধে নিজ ভাইয়ের দাফন ও কাফন সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন সে যেন তা সুচারুভাবে সম্পাদন করে। এর থেকে প্রকাশ পায় যে অসন্তোষের কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ সম্পাদন।

(সহী বুখারী, ২য় খন্ড)

উন্নতির একটাই পথ- খোদাকে চিনুন এবং তাঁর প্রতি জীবন্ত ঈমান সৃষ্টি করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

ইসলাম কাউকে অলস বানায় না। নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকরির কাজেও ব্যস্ত থাকুন। কিন্তু খোদার জন্য কোনও সময় ফাঁকা না রাখাকে আমি পছন্দ করি না। ব্যবসার সময় অবশ্যই ব্যবসা করুন আর আর সেই সময়ও আল্লাহ্‌র ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখুন, যাতে সেই ব্যবসাও আপনার জন্য ইবাদতে পরিণত হয়। নামাযের সময় নামায ত্যাগ করবেন না। প্রতিটি বিষয়ে যে বাধা-ই আসুক না কেন,ধর্মকে প্রাধান্য দিবেন। জাগতিকতা-ই যেন একমাত্র লক্ষ্য না হয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন ধর্ম হয়। তখন জাগতিক কাজকর্ম ও ধর্মের কাজ বলেই গণ্য হবে। সাহাবাদেরকে দেখুন, তাঁরা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও খোদাকে ত্যাগ করেন নি। যুদ্ধ ও তরবারির যুগ এমন ভয়ানক যে, কল্পনামাত্রই মানুষ শিউরে ওঠে। ক্রোধ ও উত্তেজনার সময়ও তারা খোদাকে ভুলে যান নি, নামায ত্যাগ করেন নি, দোয়া করেছেন।এখন এটা দুর্ভাগ্য যে, এমনিতে সকল প্রকার শক্তি প্রয়োগ করে, বড় বড় ভাষণ দেয়, মুসলমানদের উন্নতির জন্য জলসা করে, কিন্তু খোদাকে এমনভাবে ভুলে বসেছে যে, ভুলেও সেদিকে মনোযোগ দেয় না। এমতাবস্থায় কিভাবে আশা করা যায় যে, তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হবে, যখন কিনা তারা সকলেই ইহজগতের জন্যই? স্মরণ রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা' মনে-প্রাণে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়, এবং নিজের সত্তার প্রতিটি কণায় ইসলামের আলোক ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তোমাদের কখনও উন্নতি হবে না। যদি তোমরা পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বল যে, তারা উন্নতি করছে, তবে এর উত্তর হল,তাদের বিষয়টি ভিন্ন। তোমাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে। তোমাদের উপর 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ) পূর্ণ হয়েছে। তাদের বিষয় ও বিচারের দিন ভিন্ন। তোমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ কর,তবে তোমাদের জন্য ইহজগতেই জাহান্নাম রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রায় প্রত্যেক শহরে মুসলমানদের উন্নতির জন্য আঞ্জুমান এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও ইসলাম দরদীর মুখ থেকে একথা বেরোয় না যে,কুরআনকে নিজেদের ইমাম করে নাও, এর উপর আমল কর। তারা কেবল একটা কথাই বলে-ইংরেজি পড়, কলেজ তৈরী কর, ব্যারিস্টার হও। এর থেকে বোঝা যায় যে, খোদার প্রতি ঈমান অবশিষ্ট নেই । ওষুধে কাজ না হলে অসুস্থ ব্যক্তি চিকিসা থেকে সরে আসে। এখানে একের পর এক ব্যর্থতা দেখেও সেই পথ থেকে ফিরে আসে না। যদি খোদা না থাকেন, তবে তাঁকে ত্যাগ করেও উন্নতি করবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু খোদা আছেন এবং অবশ্যই আছেন, অতএব তাঁকে ত্যাগ করে কখনই উন্নতি করতে পারবে না। তারা চায় তাঁকে অসম্মান করে, তাঁর কিতাবের অসম্মান করে সফলতা লাভ করতে এবং জাতি হিসেবে সুসংগঠিত হতে। কখনই সম্ভব নয়।

আমার মত একটাই, চোখ যেটা দেখতে পায়, উন্নতির একটাই পথ- খোদাকে চিনুন এবং তাঁর প্রতি জীবন্ত ঈমান সৃষ্টি করুন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪)

জান্নাত অলস প্রবৃত্তির মানুষদের স্থান নয়। সেখানে বসবাসকারীরাও কাজ করবে। কেননা যদি কাজ না করতে হত ,তবে ক্লান্তি না আসার কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর– এর ২৬ আয়াত

وَاِنَّ رَبَّکَ ہُوَ یَحۡشُرُہُمۡ ؕ اِنَّہٗ حَکِیۡمٌ عَلِیۡمٌ

এর ব্যাখ্যায় বলেন–

জান্নাতে তাদেরকে ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে না,, তাদেরকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতেও মানুষ কাজ করবে, কিন্তু পার্থক্য হল সেখানে মৃত্যু আসবে না, কেননা মৃত্যুর লক্ষণ হল ক্লান্তি। ক্লান্তির অর্থই মানুষের দেহ থেকে কিছু মেদ অথবা অন্য কোনও উপকারী অংশ নিষ্কাষিত হয়েছে। আর ক্লান্তি হল কাজ ত্যাগ করে বিশ্রাম নেওয়ার এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য শরীরের পক্ষ থেকে সংকেত প্রেরণ করা। আমি একটি চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়েছি, একবার হাত নাড়ালে মানুষের শরীরের কয়েক লক্ষ কোষ ধ্বংস হয়। তাই কিছু সময় কাজ করার পর যখন ক্লান্তি অনুভূত হয়, তখন তা এ বিষয়ের লক্ষণ যে শরীর থেকে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন সেই ক্ষতি পূর্ণ কর। কাজেই ক্লান্তি হল ধ্বংসের প্রতীক। আর সেখানে ক্লান্তি থাকবে না– একথা বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সেখানে দেহ হবে পরিবর্তনশীল। এর থেকে এও জানা গেল যে, খাদ্য যা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে, সেখানে সেই ক্ষয় পূরণ করার কাজ করবে না, বরং তার কাজ হবে আরও শক্তিশালী করা। অর্থাৎ সেই জীবনে এগিয়ে চলাই হবে লক্ষ্য।

যেহেতু ক্লান্তির পরিণামে উদ্ভুত এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষয়ের পরিণামে মানুষের মৃত্যু আসে, কেননা ক্রমাগতভাবে শরীরের শক্তিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে এই ধরণের ক্ষয় নেই। এই জন্য বলা হয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না। অর্থাৎ এখন তাদের জন্য কোনও মৃত্যু নেই।

স্মরণ থাকে যে, জান্নাত হলএকটি আধ্যাত্মিক অবস্থা। যদিও রূপক ভাষায়

(এরপর ৭ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

ওয়াকফে নও ক্লাসের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: কুরআন করীমের সূরা রহমানে জিন এবং ইনস-এ উল্লেখ রয়েছে। ইনস-এর অর্থ মানুষ আর জিন বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জিন বলতে অনেক কিছু হতে পারে। যে কোন অপ্রকাশিত সত্তাকে জিন্ন বলে। এই কারণে হাদীসে ব্যাকটেরিয়ার জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে জঙ্গলে তোমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর নিজেকে পরিস্কার করার জন্য যদি কোন হাড়ের টুকড়ো পাও, তবে সেটি ব্যবহার করো না। কেননা তাতে জীবাণু থাকে। অদৃশ্য বস্তু থাকে। তাই এর পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করো।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাহাড়ের মধ্যে অন্তরালে জীবনযাপনকারী লোকদেরও জিন্ন বলা হয়। যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তি সচরাচর জনসমক্ষে আসে না, তারাও জিন্ন। এই কারণে কিছু মানুষকে এজন্যও জিন বলা হয়ে থাকে কারণ তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার কিছুটা উর্দ্ধে বলে মনে করে। তাই এভাবে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সারসংক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক গোপন বস্তু বা নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী মানুষদের জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: যেদিন আপনি খলীফা হলেন, সেদিন আপনার অনুভূতি কেমন ছিল? এটি তো অনেক বড় দায়িত্ব।

সেদিনের ভিডিও দেখে নিও। এম.টি.এ-র দল অনেক স্থানের ছবি তুলে রেখেছে, তাদেকে দেখাতে বলো, দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে। কেমন লাগছিল তা আমার মুখটিতে দেখতে পাবে।

প্রশ্ন: খিলাফতের পূর্বে আপনি রাইডিং (অশ্বারোহন)করতেন। এখন কি রাইডিং করার সময় পাওয়া যায়?

আগেও আমি নিয়মিত রাইডিং করতাম না। তবে শিক্ষাজীবনে রাইডিং করতাম, এখন সময় পাই না। কিন্তু কখনও কখনও, দুই-চার মাসের পর ইসলামাবাদে গেলে রাইডিং করা দেখি। সেখানে জামাত ঘোড়া রেখেছে, জামেয়ার ছাত্ররা সেখানে অশ্বারোহণ করতে আসে। আতফালরা অশ্বারোহন করলে সুযোগ পেলে কখন কখনও সেখানে গিয়ে দেখি।

প্রশ্ন: 'ওয়াকফে নও'-এর অর্থ কি?

হুযুর বলেন, ওয়াকফে নও-এর অর্থ নতুন ওয়াকফ। অর্থাৎ- শিশুদেরকে ওয়াকফ করার যে নতুন স্কীম বের হয়েছে, যার অধীনে পিতামাতা তাদের সন্তানকে জন্মের পূর্বেই ওয়াকফ করে দেয় আর সন্তান বড় হয়ে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর পুনরায় এই মর্মে বন্ড লেখে যে 'আমি আত্মোৎসর্গ করতে চাই'। আরেকটি হল ওয়াকফে আওলাদ'। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, দুই চার বছর যখন তার বয়স হয়, সে সময় পিতামাতা তাকে ওয়াকফ করার বাসনা করে। তখন সেই সন্তান ওয়াকফে আওলাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্কীমটি আগে থেকেই চলছে।

প্রশ্ন: আমাদের একটি ইসলামী প্রদর্শনী হয়েছিল। এক খৃষ্টান বন্ধু আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে সূরা মায়েদায় খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)কে প্রশ্ন করেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে কি আপনার এবং আপনার মায়ের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? সেই ব্যক্তি বলেন, আমরা তো হযরত ঈসা (আ.)-এর মায়ের ইবাদত মোটেই করি না। অথচ কুরআন শরীফে লেখা আছে যে ইবাদত করে।' এভাবে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে কুরআন করীম ভুল বর্ণনা দিয়েছে। নাউযু বিল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইবাদত করে না, কে বলেছে? হযরত ঈসা (আ.) এর সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস যে তিনি আকাশে বসে আছেন। এছাড়া তারা বলে, খোদা তিন সত্তার সমষ্টি। তার তিন খোদায় বিশ্বাসী, পিতা-পুত্র-রুহুল কুদুস। খোদা যেহেতু তিনজন, আর ইবাদত খোদার করা হয়, যখন চাওয়া হয় তখন ঈসা (আ.)-এর নামে চাওয়া হয়। খোদার সামনে হাত না পেতে এভাবে ক্রুশ লাগিয়ে রাখে। এগুলিই তো ইবাদত, ইবাদত আর কি? তারা যা কিছু প্রার্থনা করে, দাবি করে যে এটি ঈসা (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন। এখন তাদেরকে বল এগুলি ছেড়ে দাও, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও। ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছে, যে ঈসার আসার কথা ছিল, তিনি আর আসবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টানদেরও অনেক ফির্কা রয়েছে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ রয়েছে। আর বাইবেলের এমন বহু আয়াত আছে যেগুলির বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আপত্তি করেছেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের পর সেগুলিকে বাইবেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাই এগুলি এমন সব কাজ যা থেকে সংশয় জন্ম নেয়। তারা সংশয়ে নিপতিত। যেমনটি আমি বলছি, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ বলেছে, হযরত ঈসা (আ.) যে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে পুনরায় আসব', কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসবেন না। সেই সময় তিনি হয়তো সুরার নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই নেশার ঘোরে পুনরায় আসার কথা বলেছিলেন।' একথা লেখা আছে আর ইন্টারনেটেও আজকাল পাওয়া যায়। তোমরা পড়ে নিও। জার্মান এবং ইংরেজিতেও সর্বত্রই ভ্যাটিক্যানের পাদ্রীদের এই বিবৃতি পাওয়া যায়। এখন তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অন্য কোন কাজ দিয়েছেন, যা করার জন্য তিনি অন্য কিছু করছেন। পৃথিবীর সংশোধন হল না, অথচ অন্য কোন জগতের সংশোধনের জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা এই সব অসংলগ্ন কথা বার্তা বলে থাকে। কুরআন করীম যা কিছু বলে সত্য বলে। আর এরা যা কিছু বলে তা নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, বাইবেলের বহু আয়াত আছে, যেগুলি নিয়ে আপত্তি করলে তারা নতুন প্রিন্ট বার করে, যেখানে সেই আয়াতগুলিকে পাল্টে ফেলা হয়। আর বাইবেলও একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ আছে। তাই তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য তৈরী করেছে আর তাঁর সঙ্গে অংশীদার করেছে।

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাত মায়েদের চরণতলে অবস্থান করে। জান্নাত প্রত্যেক মায়ের চরণতলে থাকে নাকি কেবল মুসলমান মায়েদের চরণতলে থাকে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে থাকার অর্থ হল মা যদি উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে থাকে আর সন্তান পুণ্যবান হয়, সৎকর্মশীল হয়, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে, তবে সন্তান পুণ্যকর্মের কারণে জান্নাতে যাবে। যে কোন মা হোক, সে যদি সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলে যার ফলে সে খোদাকে চিনতে পারে, আর খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার পথ অনুসন্ধান করে, তবে সেই মা সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। হযরত মূসা (আ.)ও তাঁর পরের নবীর সুসংবাদ দান করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)ও এমন সংবাদ দিয়েছিলেন। পূর্বের নবীরা আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণ বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। তারা যদি তাঁকে মান্য না করে, তবে মোমেন হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, খৃষ্টান, ইহুদী এবং মাজুসীদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা মোমেন হলে তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে। এর অর্থ এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, তারা নিজেদের পুণ্যের কারণে আঁ হযরত (সা.)এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাঁকে মান্য করবে আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তাছাড়া জান্নাত ও দোযখের সিদ্ধান্ত করা আল্লাহ্র কাজ, মানুষের কাজ নয়। এর অর্থ এই যে একজন মোমেন ও মুসলমান মহিলা যদি নিজের সন্তানের সঠিক লালন পালন করে, তাকে আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দেশ মান্যকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ্র ইবাদতকারী বানাতে পারে। আর সেই সন্তান যদি সৎকর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যাবে। তাই এমনটি বলা যাবে না যে অন্যান্য মায়েরা যারা মুসলমান নয় তারা নিজেদের সন্তানের সঠিক লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষা দিলেও জান্নাতে যাবে না। কেননা বহু উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল। যে কোন ব্যক্তিকে যে কোনও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাতে পাঠাতে পারেন। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বির্তক আরম্ভ হয়। এক ব্যক্তি বলল, তুমি এই এই অসৎ কাজ কর, তাই তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না। আর আমাকে দেখ, কত সব পুণ্য কর্ম করি, ইবাদত করি। আমার মর্যাদা উচ্চ। যাইহোক মৃত্যুর পর উভয়ে আল্লাহ্ দরবারে উপস্থিত হল। আল্লাহ্ তা'লা বললেন, জান্নাত বা দোযখের বিচার করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? একমাত্র আমিই জান্নাতে কিম্বা দোযখের বিচার করি। যাকে তুমি বলেছ সে জান্নাতে যাবে না, দোযখে যাবে, তাকে আমি জান্নাতে পাঠাচ্ছি আর আর তুমি মহান ইবাদতকারী আর সৎকর্মশীল হওয়া নিয়ে তোমার মধ্যে যে অহংকার জন্ম নিয়েছিল, সেই কারণে তোমাকে দোযখে পাঠাচ্ছি। এর বিচার আল্লাহ্ তা'লা করবেন। আর এর অর্থ হল মা যদি ভাল করে সন্তানদের লালন পালন করে, শিক্ষাদীক্ষা দেয়- আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমন মুসলমান মোমেন মায়ের সন্তান ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতে যাবে, সেই সব পুণ্যকর্মের সুবাদে যা তারা উন্নত শিক্ষাদীক্ষার কারণে করবে।

প্রশ্ন: জামাতের ক্যালেন্ডারগুলিতে আয়াত লেখা থাকে কিম্বা খলীফাদের ছবি থাকে। বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর সেগুলি

এরপর শেষের পাতায়...

জুমআর খুতবা

বন্দি মহিলাদেরকে বণ্টন করা হোক বা তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হোক– এ সময় মহানবী (সা.) এমন একটি আদেশ দিয়েছিলেন যা তাঁর দয়ার ব্যাপকতা এবং তিনি যে নারীজাতির পরিত্রাতা ছিলেন– তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য।

মহানবী (সা.) বলেন, যে বন্দি মহিলাকেই বণ্টন করা হোক বা বিক্রয় করা হোক না কেন, তার সাথে যদি ছোটো ছেলে বা মেয়ে থাকে তাহলে সেই শিশুসন্তানকে যেন সাবালক হওয়ার আগে পর্যন্ত তার মা থেকে পৃথক করা না হয়। ঠিক তেমনি যদি ছোটো দুই বোন থেকে থাকে তাহলে সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকেও যেন পৃথক করা না হয়।

হযরত সা'দ (রা.) বনু কুরায়যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমি তাদের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করছি যে, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক। আর (তাদের) ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হোক এবং ঘরবাড়ি মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক, আনসারদের নয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে সা'দ! তোমার এই রায় আল্লাহ্ তা'লার সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা সপ্তম আকাশে করেছেন।

মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। আরেক রেওয়ায়েত মতে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হও।

এটি ছিল 'রহমতুল্লিল আলামীন' (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এবং নারীদের প্রতি মহানুভবতা আর বন্দিদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এবং নিজ বিরোধীদের প্রতি মহানুভবতা। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখুন! তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে মানুষকে ঘরছাড়া করছে, বের করে দিচ্ছে, হত্যা করছে আর এর পরিণতি যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো, মুসলমানদের নিজেদের সম্মান পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল মুসলমানকে বিবেকবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন।

বনু কুরায়যার যুদ্ধ শেষে বনুকুরায়যাকে শাস্তি প্রদান এবং অন্যান্য ঘটনার বিবরণ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২৫ শে অক্টোবর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৫ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পরিখার যুদ্ধে বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গের কারণে এই যুদ্ধের পর তাদের দুর্গ অবরোধের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, যেন মুসলমানদের ক্ষতিসাধন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়।

এর বিশদ বিবরণ হলো, অবরোধ যখন তীব্র রূপ ধারণ করে তখন মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনু কুরায়যা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯)

বনু কুরায়যার অবরোধ কতদিন পর্যন্ত ছিল– এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দশ দিনের উল্লেখ আছে, কোনোটিতে পনেরো দিন, কতক বর্ণনায় চৌদ্দো দিন আবার কোনোটিতে পঁচিশ দিনও উল্লেখ করা হয়েছে।

(আত্তাবাকাতুলকুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭, ৫৯) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত পর্যালোচনাকরে বর্ণনা করেছেন যে, এই অবরোধের মেয়াদকাল ছিল কমবেশি প্রায় কুড়ি দিন।

(সূত্র- সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা০-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫৯৯)

এই মীমাংসার জন্য হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে বিচারক মনোনীত করা হয়। এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) ইহুদীদের বন্দি করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। এই কাজের তত্ত্বাবধান করেন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)। নারী ও শিশুদেরকে দুর্গ থেকে বাহিরে এনে এক পাশে রাখা হয়। আর এদের ওপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। আর যা কিছু তাদের দুর্গের ভেতরে ছিল যেমন, অস্ত্রশস্ত্র, জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি জড়ো করা হয়। তারা সেখানে ১৫শ তরবারি, ৩শ বর্ম, ২ হাজার বর্শা, ১৫শ চামড়ার ঢাল এবং অনেক জিনিসপত্র পান। অনেক তৈজসপত্র, মদ, মটকা এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য পান যেগুলো ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়। এছাড়া অনেক উট এবং অন্যান্য পশুও পাওয়া যায়, যেগুলো সব জড়ো করা হয়। অওস গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমাদের মিত্ররা অনুতপ্ত ও উদ্বিগ্ন। তাই আমাদের খাতিরে তাদেরকে ক্ষমাকরে দিন। মহানবী (সা.) নীরবে বসে থাকেন। অওস গোত্রের লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকে আর এক পর্যায়ে গোত্রের সবাই চলে আসে এবং অনুনয় বিনয় করতে থাকে;তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাদের বিষয়ে মীমাংসার দায়িত্ব তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের ওপর অর্পণ করা হলে তোমরা কি এতে সম্মত হবে? সবাই বলেন, (অবশ্যই) কেন নয়! তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব সা'দ বিন মুআযেরপ্রতি অর্পণ করা হলো।

অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, মীমাংসার জন্য আমার সাহাবীদের মধ্য হতে যাকে চাও বেছে নাও। তখন তারা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে বেছে নেন (আর) মহানবী (সা.)-ও এতে সম্মতহন। হযরত সা'দ (রা.) অওস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং বনু কুরায়যার মিত্র ছিলেন। এতে অওস গোত্রের লোকেরা শুধুমাত্র আশ্বস্তই হয় নি বরং আনন্দিত হয়ে যায়; কেননা তাদের ধারণা ছিল, এখন বিষয়টি আমাদের অনুকূলে চলে এসেছে। মিত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা আরবের রীতি ছিল, কিন্তু (এক্ষেত্রে) ঐশী নিয়তি ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

এবং হযরত সা'দ (রা.)-র পবিত্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় সকল আত্মীয়তা ও সম্পর্কের ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কেই প্রাধান্য দিয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) সে সময় মদীনার মসজিদে রাফিদা আসলামিয়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আহতদের সেবাযত্ন করতেন আর মসজিদের ভেতরেই তার একটি তাঁবু ছিল। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে সেই তাঁবুতে রেখেছিলেন যেন (তার) চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করা যায়আর সহজে তার সাথে দেখাসাক্ষাৎও করা সম্ভব হয়। মহানবী (সা.) যখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র হাতে বিষয়টি অর্পণ করেন তখন অওস গোত্রের সদস্যরা তার কাছে যায় এবং তাকে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করায়, যার জিন ছিল খেজুর গাছের ছালের এবং জিনের ওপর চামড়ার গদি পাতা ছিল। এর লাগামও খেজুর গাছের আঁস দিয়ে বোনা হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) স্থূলকায় যুবক ছিলেন। লোকেরা হযরত সা'দ (রা.)-র চারপাশে সমবেত হয়ে বলতে আরম্ভ করে, হে আবু আমর! মহানবী (সা.) অওস গোত্রের মিত্রদের বিষয়টি আপনার ওপর ন্যস্ত করেছেন যেন আপনি তাদের সাথে সদাচরণ করেন। আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইতিমধ্যে আরও অনেক মানুষ সমবেত হয়, কিন্তু হযরত সা'দ (রা.) নীরব থাকেন। লোকেদের পীড়াপীড়ি যখন বেড়ে যায় তখন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে, আমি আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোনো তিরস্কারকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না।

হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন আর মানুষজনও তাঁর (সা.) নিকটে উপবিষ্ট ছিল। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) যখন সেই মসজিদের নিকটে আসেন যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন- যেটি বনু কুরায়যার অবরোধের সময় নামায পড়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল- তাকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। আরেক রেওয়ায়েত মতে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হও।

বনু আব্দে আশহালের লোকেরা বলে, আমরা হযরত সা'দ (রা.)-র জন্য দুটি কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে থাকে, যতক্ষণ না তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, হে সা'দ! তাদের মাঝে মীমাংসা করো। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.) মীমাংসা করার বেশি অধিকার রাখেন। মহানবী (সা.) বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; (কিন্তু) আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি তাদের বিষয়ে মীমাংসা করো। অওস গোত্রের লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, হে আবু আমর! মহানবী (সা.) আপনার মিত্রদের (বিষয়ে) মীমাংসা করার (দায়িত্ব) আপনার ওপর ন্যস্ত করেছেন। তাই আপনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং তাদের দুর্দশাকে আপনার সামনে রাখুন। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তোমরা কি বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তে মেনে নেবে? তারা বলে, হ্যাঁ, মানবো। আমরা আপনার মীমাংসার বিষয়ে তখন থেকেই সম্মত যখন আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ আপনার অনুপস্থিতিতেও আমরা আপনার নাম প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের পক্ষ থেকে আপনি স্বাধীন। আমরা প্রত্যাশা রাখি, আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন; যেভাবে আপনি ছাড়াও অন্য কেউ তাদের মিত্র বনু কায়নুকার প্রতি করেছিল। আমরা আপনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি এবং আজকের দিনে আমরা আপনার মীমাংসার একান্ত মুখাপেক্ষী। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এরপর তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনার এ কথার অর্থ কী যে, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি! আমার সিদ্ধান্তই কি কার্যকর হবে? (কথা) পাকাপোক্ত করার জন্য দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, (অবশ্যই)। এরপর হযরত সা'দ (রা.) সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যেদিকে মহানবী (সা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের কারণে তাঁকে সম্বোধন না করে বলেন, আর এদিকে উপবিষ্ট লোকেরাও কি একই অঙ্গীকার করছেন? (অর্থাৎ) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেন। মহানবী (সা.) এবং (তাঁর পাশে বসে থাকা) লোকেরাও বলেন, জ্বি হ্যাঁ। এরপর হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করছি যে, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক। আর (তাদের) ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হোক এবং ঘরবাড়ি মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক, আনসারদের নয়। আনসাররা বলে, আমরা তাদের ভাই। তাদের সাথেই ছিলাম। তিনি বলেন, আমি চাই তোমাদের ওপর তাদের নির্ভরশীলতার যেন অবসান ঘটে, অর্থাৎ মুহাজিরগণ যেন কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করতে পারে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে সা'দ! তোমার এই রায় আল্লাহ্ তা'লার সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা সপ্তম আকাশে করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই ফেরেশতারা আমাকে সেহ্‌রীর সময় অবহিত করেছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯-১১) (শারাহ যিরকানি আলাল মোওয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৮১)

এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন যে, অবশেষে প্রায় বিশ দিনের অবরোধের পর এই দুর্ভাগা ইহুদীরা এমন একজন ব্যক্তিকে তাদের বিচারক হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে সম্মত হয় যিনি তাদের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের কর্ম কাণ্ডের কারণে নিজ হৃদয়ে তাদের প্রতি কোনো দয়া অনুভব করছিলেন না। তিনি যদিও ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, কিন্তু তার হৃদয়ে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন-এর ন্যায় ভালোবাসা ও দয়া থাকা সম্ভব ছিল না। সংক্ষিপ্তাকারে এর বিবরণ হলো, অওস গোত্র বনু কুরায়যার পুরোনো মিত্র ছিল আর সেই যুগে এই গোত্রের নেতা ছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি পরিখার যুদ্ধে আহত হয়ে তখন মসজিদ প্রাঙ্গনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হযরত সা'দ বাহনে আরোহণ করে আসছিলেন। পথিমধ্যে অওস গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি তার কাছে জোর দিয়ে বারংবার এই আবেদন করে, বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র; যেভাবে খাযরাজ গোত্র তাদের মিত্র বনু কায়নুকার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করেছিল আপনিও বনু কুরায়যার প্রতি নমনীয় আচরণ করুন আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন না। সা'দ বিন মুআয প্রথমে নীরবে তাদের কথা শুনছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যখন অত্যধিক জোর দেওয়া হয় তখন হযরত সা'দ বলেন,

"এটি এমন এক সময় যখন সা'দ সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরোয়া করবে না। এই উত্তর শুনে লোকেরা নীরব হয়ে যায়। "

হযরত সা'দ যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন 'কূমূ ইলা সাইয়্যিদিকুম'অর্থাৎ তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও এবং বাহন থেকে অবতরণে তাকে সাহায্য করো। যখন সা'দ (রা.) বাহন থেকে নেমে মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হন তখন তিনি (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, হে সা'দ! বনু কুরায়যা তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করেছে আর তুমি তাদের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে- তারা তা মেনে নেবে। এ কথা শুনে হযরতসা'দ নিজ গোত্র অওস-এর লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, عَلَيْكُمْ بِذَالِكَ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ إِنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِمَا حَكَمْتُ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে এই দৃঢ় অঙ্গীকার করছো যে, তোমরা সর্বাবস্থায় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে যা আমি বনু কুরায়যা সম্পর্কে প্রদান করব? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করছি। এরপর সা'দ মহানবী (সা.) যেদিকে উপবিষ্ট ছিলেন সেদিকে ইশারা করে বলেন, وَعَلَى مَنْ هٰهُنَا অর্থাৎ আর যে সত্তা এখানে উপবিষ্ট রয়েছেন তিনিও কি এই অঙ্গীকার করছেন যে, তিনিও সর্বাবস্থায় আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবেন? তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি অঙ্গীকার করছি।

এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর সা'দ (রা.) তার সিদ্ধান্ত শোনান যা এরূপ ছিল:

বনু কুরায়যার যোদ্ধাদের অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও সন্তানদেরকে বন্দি করা হোক। তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হোক।

মহানবী (সা.) যখন এই সিদ্ধান্ত শুনেন তখন অবলীলায় বলে উঠেন, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ অর্থাৎ তোমার এই সিদ্ধান্ত একটি ঐশী নিয়তি, যা অটল। তাঁর এই কথার অর্থ ছিল, বনু কুরায়যা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত এমন পরিস্থিতিতে হয়েছে যাতে পরিষ্কারভাবে ঐশী হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে প্র তীয়মান হয় আর এ কারণে তাঁর (সা.) দয়া এটিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। আর প্র কৃত অর্থেই একথা সঠিক ছিল। কেননা বনু কুরায়যার পরামর্শের জন্য হযরত আবু লুবাবাকে আহবান জানানো আর হযরত আবু লুবাবার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কিয়ামত দিবসে আমিই হব সর্বপ্রথম 'শাফায়াত' দানকারী আর সর্বপ্রথম আমার 'শাফায়াত' গৃহীত হবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

মুখ দিয়ে এমন একটি কথা বেরিয়ে যাওয়া যা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ছিল; পক্ষান্তরে বনু কুরায়যার মহানবী (সা.)-কে বিচারক হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানানো,অপরদিকে অওস গোত্রের লোকেরা আমাদের মিত্র, তাই তারা আমাদের ছাড় দিবে-এই ধারণা করে অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে তাদের বিচারক নির্ধারণ করা, আর এরপর সত্য ও ন্যায়ের পথে হযরত সা'দ (রা.)-র এমন সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়া যার ফলে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির অনুভূতি মন থেকে সম্পূর্ণ লোপ পায়, আর পরিশেষে সা'দ (রা.)-র নিজ রায় ঘোষণার প্রাক্কালে মহানবী(সা.)-এর নিকট হতে এ মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করা যে, সর্বাবস্থায় এই সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে- এই সমস্ত বিষয় কাকতালীয় হতে পারে না। আর নিঃসন্দেহে এর নেপথ্যে ঐশী তকদীর কাজ করছিল। এই সিদ্ধান্ত ছিল খোদা তা'লার, সা'দ (রা.)-র নয়। "

(সূত্রঃ সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃঃ ৫৯৯-৬০১)

সা'দ বিন মুআয (রা.)-র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে আরো লেখা আছে, হযরত সা'দ যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন তখন মহানবী (সা.) ৯ যিলহজ্জ রোজ বৃহস্পতিবার মদীনায় ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) ৫ যিলহজ্জ তারিখে ফিরে আসেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন, মহানবী (সা.) ৭ যিলহজ্জ তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন এবং দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেই যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে তিনি(সা.) আদেশ দেন যে, তাদেরকে যেন মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। নারী ও শিশুদের হযরত রামলা বিনতে হারেস (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তাদের সকলকেই হযরত রামলা বিনতে হারেস (রা.)-র বাড়িতে বন্দি করা হয় এবং মহানবী (সা.) তাদের জন্য খেজুর নিয়ে আসার নির্দেশ দিলে সমস্ত খেজুর মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লোকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেজুর নিয়ে আসে এবং ইহুদীরা রাতভর পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করে। মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও পোশাক ইত্যাদি হযরত রামলা (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন আর উট ও ছাগলের পাল সেখানেই বৃক্ষের নীচে চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১,১২) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড,পৃঃ ৫৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, সম্ভবত বনু কুরায়যা গোত্রের অঙ্গীকারভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ, অরাজকতা ও নৈরাজ্য এবং হত্যা ও রক্তপাতের কারণে ঐশী আদালত থেকে এই রায় আসে যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। যেমন প্রথমত মহানবী (সা.)-এর এই যুদ্ধ সম্পর্কে খোদার পক্ষ থেকে আহুত হওয়া থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি ঐশী তকদীর ছিল; কিন্তু খোদা তা'লা এটি চান নি যে, তাঁর রসূলের মাধ্যমে এই রায় প্রকাশিত হবে। তাই তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অদৃশ্য হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছেন আর সা'দ বিন মুআয (রা.)-র মাধ্যমে এই রায় ঘোষণা করান। আর রায়টিও এমনভাবে (ঘোষণা) করিয়েছেন যে, তখন মহানবী (সা.) মোটেও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না; কেননা তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন যা সা'দ বিন মুআয করবেন। তাঁর (সা.) প্রতি অমুসলিমরা ও আপত্তিকারীরা আর কখনো কখনো আমাদের যুবসমাজকেও মানুষ এটি বলে বিষিয়ে তোলে যে, বনু কুরায়যার প্রতি তিনি (সা.) অন্যায় করেছেন। এই আপত্তির স্পষ্ট উত্তর হলো, তিনি (সা.) তো রায় দেন নি! এছাড়া রায়ও আল্লাহ্ তা'লা তাদের মিত্র দ্বারাই করিয়েছেন এবং তিনিও তাঁর (সা.) নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রভাব কেবল মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরং সমস্ত মুসলমানদের ওপর পড়তো তাই তিনি (সা.) নিজ রায় দ্বারা, তা যতই ক্ষমা ও দয়ার ভিত্তিতে হোক না কেন- এই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার অধিকার আছে বলে মনে করতেন না। এটিই সেই ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল যার ক্ষমতা ও শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তাঁর (সা.) মুখ থেকে স্বভাবতই এই শব্দাবলি নিঃসৃত হয়েছে যে, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ।অর্থাৎ, হে সা'দ! তোমার এই রায় তো ঐশী তকদীর বলে মনে হচ্ছে, যা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। একথা বলে তিনি (সা.) নীরবতার সাথে সেখান থেকে উঠেন এবং শহরের দিকে চলে আসেন। তখন তাঁর (সা.) মন এই ধারণায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল যে, একটি জাতি যাদের ঈমান আনার বিষয়ে তাঁর (সা.) হৃদয়ে প্রবল বাসনা ছিল, নিজেদের অপকর্মের কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে গেল এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ও শাস্তির কোপানলে নিপতিত হচ্ছে। সম্ভবত এ পরিস্থিতিতে তিনি (সা.) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন, لَوْ اٰمَنَ بِيْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَلَا مَنَتْ بِيَ الْيَهُوْدُ অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্য থেকে যদি দশজন ব্যক্তি তথা দশ-বারোজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও ঈমান আনত তবে আমি খোদার কাছে আশা রাখতাম যে, এই পুরো জাতি আমাকে মেনে নিত এবং ঐশী রোষানল থেকে বেঁচে যেত। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি (সা.) নির্দেশ দিলেন, বনু কুরায়যার পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরকে পৃথক করে দেওয়া হোক। অতঃপর উভয় শ্রেণিকে পৃথক করে মদীনায় নিয়ে আসা হয় এবং শহরে দুটি পৃথক স্থানে একত্রিত করা হয় আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে সাহাবীরা বনু কুরায়যার খাবারের জন্য ফলের স্তুপ করে দেন, যেখানে কি-না তাদের মাঝে অনেকেই হয়ত ক্ষুধার্ত থাকবেন। আর লেখা আছে, ইহুদীরা রাতভর ফল আহারে মগ্ন ছিল। "

(সূত্র-সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ,পৃঃ ৬০১-৬০২)

সকাল হতেই মদীনার একটি বাজারে গর্ত খোদাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা আবু জাহাম আদভীর ঘর থেকে নিয়ে আজারুয যায়েদ পর্যন্ত খোদাই করা হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) আসেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য সাহাবীরাও ছিলেন। তিনি (সা.) বনু কুরায়যার পুরুষদেরকে ডাকেন। তাদেরকে ছোটো ছোটো দল আকারে আনা হতো এবং এই গর্তে ফেলে হত্যা করা হতো। তাদেরকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা কা'ব বিন আসাদকে বলে, তোমার অভিমত কী? মুহাম্মদ (সা.) কী করতে যাচ্ছে? সে বলে, যা তোমাদের খারাপ লাগবে তা-ই করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ যা তোমাদের ভালো লাগবে না। তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কোনো অবস্থাতেই বুঝতে চাও না।যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে সে তো কাউকে ছাড়ছে না, আর যে ব্যক্তি যাচ্ছে সে তো আর ফেরত আসছে না। আল্লাহ্র কসম! তার জন্য তরবারিই রয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তোমাদের বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি তোমাদেরকে অন্য কথার দিকে ডেকেছিলাম কিন্তু তোমরা অস্বীকার করেছ। ইহুদীরা বলল, এটি রাগের সময় নয়। আমরা যদি তোমার মতামত মেনে নিতাম তাহলে আমরা কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আমাদের মধ্যকার বিদ্যমান অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণ হতাম না? হুয়ী বিন আখতাব বলে, এখন এসব কথা বাদ দাও। এখন তোমাদের কোনো অপরাধ ক্ষমা করা হবে না। এখন কেবল তরবারির জন্য অপেক্ষা করো। হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে ইহুদীদের হত্যার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে, কিছু বন্দিকে হত্যার জন্য বিভিন্ন সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণে লেখেন, পরের দিন সকালে সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবার ছিল। মহানবী (সা.) কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) নিজেও নিকটবর্তী একটি স্থানে বসে ছিলেন যেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় যদি এমন কোনো বিষয় সামনে আসে যাতে তাঁর দিকনির্দেশনার প্র য়োজনহয়, তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন। এছাড়া কোনো অপরাধীর পক্ষ থেকে যদি অনুগ্রহের আবেদন করা হয় তিনি যেন অনতিবিলম্বে রায় দিতে পারেন। যদিও সা'দের বিষয়টি তাঁর (সা.) সামনে আদালতের আইন অনুযায়ী উপস্থাপন হতে পারত না, কিন্তু একজন বাদশা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি (সা.) যে-কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই প্রাণভিক্ষার আবেদন অবশ্যই শুনতে পারতেন। তিনি অনুগ্রহের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে এ নির্দেশও দেন যে, অপরাধীদের যেন একজন একজন করে পৃথকভাবে হত্যা করা হয়, অর্থাৎ একজনের হত্যার সময় যেন অন্য কেউ সামনে না থাকে। সুতরাং একজন একজন করে অপরাধী আনা হয় এবং সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হত্যা করা হয়।"

বনু নযীরের প্রধান হুয়ী বিন আখতাব এসে মহানবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার বিরোধিতা করা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই? কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, যে

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। - *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

খোদাকে পরিত্যাগ করে খোদাও তাকে পরিত্যাগ করেন। এরপর লোকদের সম্বোধন করে বলতে লাগল, খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কারো কিছু করার সাধ্য নাই। এটি তাঁরই নির্দেশ এবং তাঁরই তকদীর। অনুরূপভাবে কা'ব বিন আসাদকে যখন হত্যা করা হয়; বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসাদকে যখন হত্যার জন্য বধ্যভূমিতে আনা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে ইঙ্গিতে মুসলমান হবার আহ্বান জানান। সে বলে, হে আবুল কাসেম! আমি তো মুসলমান হয়ে যেতাম; কিন্তু মানুষজন বলবে, সে মৃত্যুকে ভয় পেয়েছে। সুতরাং আমাকে ইহুদী অবস্থায় মরতে দাও।

এক ইহুদী রিফাআ-র ক্ষমা সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, রিফাআ নামক আরেক ইহুদী এক দয়ালু মুসলমান নারীকে অনুনয়বিনয় করে তাকে নিজের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয় এবং মহানবী (সা.) সেই মুসলমান নারীর সুপারিশে রিফাআকেও ক্ষমা করে দেন। মোটকথা সেদিন যে ব্যক্তির সুপারিশ তাঁর কাছে উপস্থাপিত হয়েছে তিনি (সা.) তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা একথার প্রমাণ যে, তিনিসা'দের সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে অপারগ ছিলেন, নতুবা তিনি কস্মিনকালেও তাদেরকে হত্যা করার বাসনা রাখতেন না।"

(সূত্র: সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৬০২)

এটি উক্ত অভিযোগের অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি জবাব যে, তিনি যুলুম করেছেন। এভাবেই ঘটনা ঘটতে থাকে, অর্থাৎ বনু কুরায়যার পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়। এই দায়িত্ব পালন সমাপনান্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান থেকে চলে গেলেন আর গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে থাকে। এরপর গর্তগুলোকে মাটি দ্বারা ভরাট করা হয়। এ সবকিছু হযরত সা'দ বিন মুআযের চোখের সামনে ঘটেছে। আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তার হৃদয় প্রশান্ত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩)

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুসারে নারীদের মাঝে কেবল নুবাতাকে হত্যা করা হয়েছিল যে বনু কুরায়যার এক ব্যক্তি হাকামের স্ত্রী ছিল। সে জনৈক মুসলমান সাহাবী হযরত খাল্লাদকে বনু কুরায়যার দুর্গের দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকা অবস্থায় ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু জীবনীকারক এ রেওয়ায়েতের সাথে একমত পোষণ করেন নি।তাদের দৃষ্টিতে বনু নযীর অথবা খায়বারের কতিপয় রেওয়ায়েত এ ঘটনার সাথে গুলিয়ে যাবার ফলে এবং অন্য কিছু সামঞ্জস্যের কারণে এই নারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনাসঠিক নয়। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

[আসসাহীহ মিন সীরাতুন নবী আল আযাম (সা.), খণ্ড-১২,পৃ:১৩৬-১৩৭]

রেহানা বিনতে যায়েদ নাযরিয়ার ঘটনাও রয়েছে। বনু কুরায়যারবন্দি মহিলা ও শিশুদেরকে মদীনার মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাদের মাঝে বনু নযীরের এক নারী রেহানা বিনতে যায়েদ ছিল, বনু কুরায়যার হাকাম নামক এক ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন। অনেকের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কারো কারো মতে তিনি (সা.) তাকে দাসী হিসেবে রেখেছিলেন আর কারো কারো মতে বিয়ে করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২৮-৪২৯)

বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে, কোনটি ভুল বা কোনটি সঠিক- তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায়। গবেষণা করলে বুঝা যায়, জীবনীকারকরা এতে ভুল করেছেন। প্রথম কথা হলো, এ রেওয়ায়েত প্রকৃত ঘটনার বিপরীত এবং বানোয়াট। আর যদি এতে কিছুটা সত্য থেকেও থাকে তাহলে কেবল এতটুকু যে, মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন আর সে তার মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আর এ রেওয়ায়েতটি সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা হলেও আসল কথা হলো, নবী করীম (সা.) তাকে বিয়ে করেছিলেন, দাসী হিসেবে রাখেন নি।

যেমন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'রেহানা' সংক্রান্ত বিষয়ে লেখেন, কতিপয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন, বনু কুরায়যার বন্দিদের মাঝে রেহানা নামের এক নারী ছিল যাকে মহানবী (সা.) দাসী হিসেবে নিজের কাছে রেখেছিলেন। আর এই রেওয়াতের ভিত্তিতে স্যার উইলিয়াম মুইর এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণ করেছে। কিন্তু সত্য কথা হলো, এই রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। প্রথমত, সহীহ বুখারীর উপরোক্ত রেওয়ায়েত এই রেওয়ায়েতকে ভুল সাব্যস্ত করে যাতে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু কুরায়যার বন্দিদেরকে সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। যদি মহানবী (সা.) কোনো নারী বন্দিকে নিজের গৃহের জন্য পৃথক করে রাখতেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুখারীর রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু বুখারীতে এর ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এছাড়াও অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়, রেহানা সেসব বন্দিদের একজন ছিল যাদেরকে মহানবী (সা.) অনুগ্রহবশত মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর রেহানা মদীনা থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পিত্রালয়ে তথা বনু নযীরে চলে যায়, আর সেখানেই অবস্থান করে। আল্লামা ইবনে হাজার যিনি ইসলামের শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের মাঝে একজন, এই রেওয়ায়েতকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যদি এটি স্বীকারও করে নেওয়া হয় যে, রেহানাকে মহানবী (সা.) নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন, তবুও নিঃসন্দেহে সে তাঁর (সা.) স্ত্রী ছিল, দাসী নয়। যেসব ইতিহাসবিদ রেহানার সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে,মহানবী (সা.) তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন, তাদের মাঝেও অধিকাংশ এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, তিনি (সা.) তাকে স্বাধীন করে তাকে বিবাহ করেছেন। ইবনে সা'দ একটি রেওয়ায়েত স্বয়ং রেহানার ভাষায় বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং এরপর আমি মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর আমাকে বিবাহ করেছিলেন। আর আমার মোহরানা বারো আওকিয়া বা চল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ হয়েছিল। ইবনে সা'দ এই রেওয়ায়েতের বিপরীতে সেই রেওয়ায়েত যেটির ওপর স্যার উইলিয়াম মুইর ভিত্তি রেখেছেন, স্পষ্টতই ভুল এবং অসত্য আখ্যা দিয়েছেন। যাহোক, এটি সন্দেহযুক্ত রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে রয়েছে। লেখা হয়েছে, এটিই জ্ঞানীদের গবেষণা। মোটকথা, প্রথমত বুখারীর রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় এবং আসাবাতে স্পষ্ট করা হয়েছে, মহানবী (সা.) রেহানাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেন নি, বরং তাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন, যার পর সে নিজের গোত্রে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। দ্বিতীয়ত যদি এই রেওয়ায়েতকে সঠিকও আখ্যা দেওয়া হয় যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন- তবুও মহানবী (সা.) তাকে স্বাধীন করে তাকে বিবাহ করেছিলেন, তাকে দাসী হিসেবে রাখেন নি, যেমনটি তার একটি রেওয়ায়েত থেকে কয়েকজন লিখেছেন। সেটি কতটুকু সত্য আল্লাহ্ ভালো জানেন। " এছাড়া একথাও স্মরণ রাখতে হবে, রেহানার নাম এবং তার বংশপরিচয় ও গোত্র সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহে এত মতবিরোধ রয়েছে যে, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাও অযৌক্তিক হবে না; বিশেষত যখন এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা হয় যে, তাকে এমন এক ব্যক্তির স্ত্রী বলা হচ্ছে যিনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।"

(সূত্র: সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৬০৪-৬০৫) (লুগাতুল হাদীস,৪র্থ খণ্ড,পৃ:৫২৭)

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার বিষয়ে বিস্তারিত লেখা রয়েছে, যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) খেজুর ভাগ করে বণ্টন করেন। এই যুদ্ধে ছত্রিশটি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ নির্ধারিত ছিল। অশ্বারোহীর জন্য এক অংশ এবং পদাতিকের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করা হয়। এক হাজার নারী ও শিশু বন্দি ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে এর এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে নেন। বন্দিদের পাঁচভাগ করেন আর সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ রেখে দেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে (কতককে) স্বাধীন করে দেন আর (কতককে) হেবা করে দেন এবং (কতককে) সেবক হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনিভাবে খেজুর থেকেও এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করেন এবং প্রত্যেক জিনিসের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে (বাকি) অংশ বণ্টন করে দেওয়া হয়। সেগুলোর প্রত্যেক অংশের জন্য লটারি করা হতো। খুমুসের জন্য যে অংশ লটারিতে উঠতো, সেটি তিনি (সা.) গ্রহণ করতেন আর মাহমিয়া বিন জাযা যুবায়দীকে খুমুসের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এরপর বাকী চারভাগ (সবার মাঝে) বণ্টন করেন। মহানবী (সা.) সে-সকল মহিলাদেরকেও অংশ প্রদান করেন যারা যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। সে-সকল মহিলাদের মাঝে হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত উম্মে আম্মারা, হযরত উম্মে সালিত, হযরত উম্মে আলাআ আনসারীয়া, হযরত সুমায়রা বিনতে কায়স, হযরত উম্মে সা'দ বিন মুআয এবং হযরত কাবসা বিনতে রাফে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাকে একটি দলের সাথে খুমুসের সম্পদ অর্থাৎ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। **(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (MSD)

কয়েদি ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন যেন এর বিনিময়ে যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে আসেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উসমান বিন আফ্ফান এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ সেগুলোর মাঝ থেকে একাংশ ক্রয় করে নেন।

(সুবুলুলহুদা ওয়াররিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১৫,১৬)

কিন্তু অপর এক ভাষ্যমতে, ঐ সকল বন্দিকে মদীনাতেই রাখা হয়, অন্য কোথাও প্রেরণ করা হয় নি। এরপর ধীরে ধীরে মহানবী (সা.) তাদেরকে অনুগ্রহস্বরূপ মুক্তি দিতে থাকেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.) গবেষণা করেছেন। তিনি (রা.) লেখেন: শিশু ও নারীরা যাদেরকে হযরত সা'দ (রা.)-র সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্দি করা হয়েছিল, তাদের বিষয়ে কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) তাদেরকে নাজদে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে কতিপয় নাজদী গোত্র তাদেরকেমুক্তিপণ আদায় করে ছাড়িয়ে নিয়েছিল আর সেই অর্থ দিয়ে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধের প্র য়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করেছিলেন। এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ নাজদী গোত্রগুলো এবং বনু কুরায়যা পরস্পর মিত্র ছিল আর বনু কুরায়যার যুদ্ধের কেবল কয়েকদিন পূর্বেই তারা আহযাবের যুদ্ধে মুসলামনদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যুদ্ধ করেছিল আর মূলত নাজদবাসীদের উসকানিতে বনু কুরায়যা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাই নাজদবাসীরা যদি তাদের মিত্র গোত্র বনু কুরায়যার বন্দিদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু সহীহরেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এসকল বন্দি মদীনাতেই ছিল; তারা অন্য কোথাও যায় নি আর মহানবী (সা.) তাদেরকে রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে বণ্টন করেদিয়েছিলেন। আবার সেই বন্দিদের অনেকে নিজেদের মুক্তিপণ প্রদান করে স্বাধীন হয়ে যায়। আর কতিপয়কে মহানবী (সা.) এমনিই অনুগ্রহ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পরবতীতে এরা ধীরে ধীরে নিজেরাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে যায়। যেমন তাদের মাঝে আতিয়া কুরেযী ও আব্দুর রহমান বিন যুবায়ের বিন বাতিয়া আর কা'ব বিন সুলায়েম এবং মুহাম্মদ বিন কা'বের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। এরা সকলে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মাঝে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন কা'ব, তিনি এক মর্যাদাবান মুসলিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

(সূত্র: সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৬০৩,৬০৪)

অতএব এ সকল বন্দি মহিলাদেরকে বণ্টন করা হোক বা তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হোক- এ সময় মহানবী (সা.) এমন একটি আদেশ দিয়েছিলেন যা তাঁর দয়ার ব্যাপকতা এবং তিনি যে নারীজাতির পরিত্রাতা ছিলেন- তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য।

মহানবী (সা.) বলেন, যে বন্দি মহিলাকেই বণ্টন করা হোক বা বিক্রয় করা হোক না কেন, তার সাথে যদি ছোটো ছেলে বা মেয়ে থাকে তাহলে সেই শিশুসন্তানকে যেন সাবালক হওয়ার আগে পর্যন্ত তার মা থেকে পৃথক করা না হয়। ঠিক তেমনি যদি ছোটো দুই বোন থেকে থাকে তাহলে সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকেও যেন পৃথক করা না হয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬) (গাযওয়াহ বনু কুরায়যা, পৃ: ১৮১)

এটি ছিল 'রহমতুল্লিল আলামীন' (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এবং নারীদের প্রতি মহানুভবতা আর বন্দিদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এবং নিজ বিরোধীদের প্রতি মহানুভবতা। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখুন! তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে মানুষকে ঘরছাড়া করছে, বের করে দিচ্ছে, হত্যা করছে আর এর পরিণতি যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো, মুসলমানদের নিজেদের সম্মান পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল মুসলমানকে বিবেকবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। (আমীন)

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ই নভেম্বর, ২০২৪)

****

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় ড্রাইভার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রত্যাশীকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ফোর হুইলার গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। (৫) কোন সরকারি কিম্বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আবেদন পত্রের সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অর্জিত অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত শংসাপত্র যুক্ত করা আবশ্যক। (৫) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে অন্তত প্রথম ৫ বছরের জন্য কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,
Mobile: 9682587713, 09682627592
ই-মেল: diwan@qadian.in

(১ম পাতার পর.....)

এর পুরস্কারসমূহকে জাগতিক পুরস্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে,কিন্তু বস্তুতপক্ষে এর পুরস্কাররাজি এমন যা মানব মস্তিষ্কের বোধগম্যের উর্দ্ধে। বস্তুত এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এই জগতে তাদেরকে শয়তানের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হত, কিন্তু সেখানে সেই সব সংগ্রাম করা থেকে তারা রক্ষা পাবে, তাদের হৃদয় যাবতীয় কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে। স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনওভাবেই শয়তান তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

এই আয়াত থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, জান্নাত অলস প্রবৃত্তির মানুষদের স্থান নয়। সেখানে বসবাসকারীরাও কাজ করবে। কেননা যদি কাজ না করতে হত,তবে ক্লান্তি না আসার কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? কাজেই যারা মনে করে যে জান্নাত হল খাদ্য রসিকদের স্বর্গ এবং আমোদ-প্রমোদের স্থান, তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। জান্নাত হলে বান্দেগীর প্রকৃত স্থান। যেমনটি বলা হয়েছে-'ফাদখুলি ফি ইবাদী ওয়াদখুলি জান্নাতী।' (সূরা ফজর) । অর্থাৎ পূর্ণ বান্দেগীর মর্যাদা লাভ হবে জান্নাতে প্রবেশের সময়। আর আব্দ বা খোদার বান্দা কাজ করে, অলস বসে থাকে না। অতএব, জান্নাতই হল প্রকৃত কাজের স্থান, যেখানে মানুষ পরিপূর্ণ আব্দ-এর মর্যাদা পাবে। জান্নাতের আসল তৃপ্তি হল সেখানে প্রবৃত্তির আবেগের টানাপড়েন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীন ভাবে ইবাদতের আনন্দ লাভ করতে পারবে। আর যে কাজে আনন্দ আসে তাতে ক্লান্তি অনুভব হয় না। সচরাচর মুসলমানেরা জান্নাতের চিত্র অঙ্কন করে তা হল মিসকীনদের আশ্রয়স্থল,যেখানে কোন কাজ করতে হবে না আর বিনা পরিশ্রমে খাদ্য পাওয়া যাবে আর কাউকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৮৩)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

নবী করীম (সা.) –এর নিবেদিত প্রাণ সাহাবাদেরও তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিল বিস্ময়কর। তারা কিভাবে নিজেদেরকে আঁ হযরত (সা.)–এর সেবায় উৎসর্গ করতেন। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই নবী করীম (সা.) তাঁর নিজের প্রাণের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। তিনি এমন বীর পুরুষ ছিলেন যে নিজের প্রাণ নিয়ে বিচলিত থাকতেন না, তাঁর উদ্বেগ মদিনাবাসীদের নিয়ে। এর জন্য তিনি প্রায় সময় নিজে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থেকেছেন আর কখনও বিশ্রামের জন্য বাহ্যত শিবিরের মধ্যে গেলেও অধিকাংশ সময়ই তাঁকে খোদার দরবারে সিজদাবনত অবস্থায়, দোয়া করতে দেখা গিয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের সময় সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ

লাজনা ইমাউল্লাহ্ ও মজলিস আনসারুল্লাহ্ (যুক্তরাজ্য)–এর ইজতেমার দিনগুলি দোয়া ও দরূদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার উপদেশ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৭ তবুক, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যেমনটি গত জুমআর খুতবাতেও উল্লেখ করেছিলাম যে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)ও আহযাবের যুদ্ধের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর বিবরণ তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, "যেহেতু মদিনার একটা বিরাট অংশ পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল আর অপরদিকে ছিল অনুচ্চ পাহাড়, কিছু পাকা ঘরবাড়ি এবং বাগান । সেই কারণে কোন সেনা অকস্মাৎ আক্রমণ করতে পারত না। তাই তারা পরামর্শের মাধ্যমে এই প্রস্তাব দিল যে," অর্থাৎ কাফেররা, "কোনওভাবে মদিনায় অবশিষ্ট ইহুদীদের বনু কুরায়যা গোত্রকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নিতে আর এর মাধ্যমে মদিনায় প্রবেশের পথ বের করতে। পরামর্শের পর বনু কুরায়যার নেতা হুই ইবনে আখতাব যে শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল আর যার কুট কৌশলের কারণে সমগ্র আরব একত্রিত হয়ে মদিনার উপর আক্রমণ করেছিল,তাকে কাফের সেনার সেনাপতি আবুসুফিয়ান দায়িত্ব দেন যে,যেভাবেই হোক বনু কুরায়যাকে নিজেদের সঙ্গে করে নাও। এই কথা মত হুই ইবনে আখতাব ইহুদীদের দুর্গে গিয়ে বনু কুরায়যার সর্দারদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইল। প্রথমত তারা সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু যখন তাদেরকে বোঝানো হল যে, এই মুহূর্তে সমগ্র আরব মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হয়েছে আর আর হৈ শহর কোনওভাবেই সমগ্র আরবের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। এই মুহূর্তে মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য যে সেনা প্রস্তুত আছে তাকে সেনাদল বলা যাবে না,বরং এটাকে একটা উত্তাল সমুদ্র বলা উচিত। এই সকল কথাবার্তা বনু কুরায়যাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গে প্ররোচিত করে আর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সেনাবাহিনী সামনের দিক থেকে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে আর পরিখা অতিক্রম করতে সফল হলে বনু কুরায়যা মদিনার অপর প্রান্ত থেকে মদিনার সেই অংশে আক্রমণ করচে যেদিকে মহিলা ও শিশুরা রয়েছে, যাদেরকে বনু কুরায়যার উপর ভরসা করে কোন নিরাপত্তা ছাড়ায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর এভাবে মুসলমানদের মোকাবেলার শক্তি সম্পূর্ণভাবে পদদলিত হবে। সেই দিক থেকেই আক্রমণ করা হোক। আর এক আঘাতে মুসলমানদের নারী, পুরুষ ও শিশু সকলকে মেরে ফেলা হবে। এটা নিশ্চিত যে, কাফেররা যদি তাদের এই পরিকল্পনার কিছুটা বাস্তবায়িত করতেও সফল হত,তবে মুসলমানদের কোনও নিরাপদ স্থান অবশিষ্ট থাকত না। বনু কুরায়যা মুসলমানদের মিত্র ছিল আর তারা যদি প্রকাশ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ না–ও করত,তবুও মুসলমানরা এই আশা করত যে, তাদের প্রান্ত থেকে মদিনায় কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। এই কারণেই তাদের দিকের অংশটা একেবারেই অসুরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

বনু কুরায়যা এবং কাফেরাও এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, যখন বনু কুরায়যা কাফেরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে,তাই তারা যেন প্রকাশ্যভাবে কাফেরদেরকে সাহায্য না করে, পাছে মুসলমানরা মদিনার সেই প্রান্তের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না করে, যে প্রান্তটি বনু কুরায়যার এলাকার সঙ্গে যুক্ত ছিল।" বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় তারা । অর্থাৎ এদিক থেকে আক্রমণ না হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে এদিকে দৃষ্টি না যায়। "এই পরিকল্পনা অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। যখন ইসলামী সেনার উপর কাফের সেনাদের জোরালো আক্রমণ হচ্ছে, ঠিক সেই সময় মুসলমানদের কে অন্ধকারে রেখে কাফেরদের সঙ্গে বনু কুরায়যার আঁতাত করে নেওয়া মদিনার সেই প্রান্তের নিরাপত্তা বজায় রাখা মুসলমানদের জন্য একেবারেই অসম্ভব করে তুলেছিল, যে প্রান্তে বনু কুরায়যার দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–২০,পৃ:২৭২–২৭৩)

শুধু নিরাপত্তার প্রশ্নই নয়, বরং সেই অংশের উপর আক্রমণের আশঙ্কাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

যাইহোক এমতাবস্থায় মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আর এর প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করাও জরুরী ছিল। তাই আঁ হযরত (সা.) মদিনার নিরাপত্তার জন্য পাঁচশ' সদস্য নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জীবনীকারগণ এর বর্ণনায় লিখেছেন– বনু কুরায়যার চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভীতির হয় আর তারা মহিলা ও শিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِذْ جَآءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا

অর্থ: যখন তাহারা তোমাদের উর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (ত্রাসে) কণ্ঠগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে। (আল আহযাব, আয়াত: ১১)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) ও মুসলমানেরা শত্রুদের সামনে ছিলেন আর বিভিন্ন স্থানে তাঁরা পালাক্রমে পরিখা পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁরা সেখান থেকে সরতে পারতেন না। জীবনীকারগণ পরিখার আটটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে পাহারা দেওয়া হত আর হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বনু কুরায়যা যেহেতু এখন চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে ঘেরাওকারী গোত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আর তাদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছতে থাকে যে তারা যে কোন মুহূর্তে মদিনায় আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) এর সংবাদ পেয়ে হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)কে দু'শ সদস্য নিয়ে এবং হযরত জুবায়ের বিন হারিসাকে তিনশ' সদস্য নিয়ে মদিনার নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি (সা.) নির্দেশ দেন যে, রাত্রিতে যেন তারা বিভিন্ন স্থানে পাহারা দেয় আর মাঝে মধ্যে আল্লাহু আকবার নারাধ্বনি দিতে থাকে।

(সুবুলুল হুদু ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮৪–৩৮৫) [আসসীহ মিন সীরাতুন নবী আল আযাম (সা.), পৃ: ২৮৮]

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.) ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"সেই সময় বাহ্যিক উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে মদিনার বাতাবরণ ঘোর তমাশাচ্ছন্ন ছিল। শহরের চতুর্দিকে হাজার হাজার রক্তপিপাসু শত্রু ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল এমন কোন সুযোগের যাতে তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাদের মাটিতে মিশিয়ে ফেলতে পারে। শহরের মুসলমানদের পাশেই ছিল বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়যা গোত্র, যাদের শত শত সশস্ত্র যুবক কোন সেনাবাহিনীর চেয়ে কম ছিল না আর যখন খুশি কিম্বা সুযোগ পেতেই পিছনের পথ দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে সক্ষম করতে পারত। অপরদিকে শহরে অবস্থানকারী মুসলমান মহিলা ও শিশুরা যে কোনও মুহূর্তেই তাদের শিকার ছিল। এমন পরিস্থিতিতে,যা কোন বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির অজানা থাকার কথা নয়, মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ তৈরী হয় আর কপট প্রকৃতির লোকেরা তো প্রকাশ্যে বলাবালি শুরু করল যে مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا । প্রতীত হয় যেন মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা সম্পর্কে খোদা ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল।"(আল আহযাব, আয়াত:১৩)

অনেক মুনাফিক আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করল যে, হে আল্লাহর রসুল! শহরে আমাদের ঘরবাড়ি একেবারেই অসুরক্ষিত হয়ে পড়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমরা বাড়িতে থেকে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতাম। এর উত্তরে খোদার ওহী নাযেল হল-

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا (আলআহযাব, আয়াত: ১৪) অর্থাৎ একথা সত্য নয় যে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি অনিরাপদ হওয়ার কারণে চিন্তিত। বরং আসল কথা হল তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের পথ খুঁজছে।"

কিন্তু এটিই ছিল খাঁটি মুসলমানদের ঈমান প্রদর্শনের সঠিক সময়।যেমনটি কুরআন করীম বর্ণনা করেছ-

وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۔(الاحزاب:23)

অর্থ: এবং যখন মো'মেনগণ সৈন্যদলগুলিকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো উহাই যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল সত্যই বলিয়াছেন।' এবং এই ঘটনা তাহাদিগকে কেবল ঈমানে ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়াইয়া দিল। (আল আহযাব, আয়াত: ২৩)

অতএব এই আক্রমণের ফলেও তাদের ঈমান ও আত্মনিবেদন আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সময়ের সংবেদনশীলতা ও পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলেই সমানভাবে সচেতন ছিলেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا

অর্থ: অর্থ: যখন তাহারা তোমাদের উর্দ্ধদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (ত্রাসে) কণ্ঠগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে, তখন মো'মেনগণকে এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

(আল আহযাব, আয়াত: ১১-১২)

এমন ভয়াবহ সময়ে মুসলমানদের মুষ্টিমেয় জামাত কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারত, যাদের মধ্যে আবার কিছু দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এবং কিছু মুনাফিকও ছিল? তাদের কাছে তো লোকসংখ্যাও তত ছিল না যা দিয়ে তারা দুর্বল স্থানগুলিতে পাহারার ব্যবস্থা করতে পারত। তাই দিনরাত কঠোর পাহারা দেওয়ার কাজ মুসলমানদের ক্লান্ত করে তুলেছিল। অপরদিকে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শহরের অলিগলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশি জোরদার করাও জরুরী ছিল, যাতে মহিলা ও শিশুরা নিরাপদ থাকে। কাফেরদের সৈন্য যে কোনও উপায়ে মুসলমানদের উপর উপদ্রব চালানোর চেষ্টায় থাকত। কখনও তারা দুর্বল স্থানগুলিতে আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হত আর মুসলমানেরা সেটিকে রক্ষার জন্য সেখানে একত্রিত হওয়া শুরু করে দিত। পরক্ষণেই তারা দিক পাল্টে অন্য কোন স্থানে শক্তি প্রয়োগ করত আর অসহায় মুসলমানেরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে যেত। কখনও তারা একই সময়ে একাধিক স্থানে আক্রমণ করতে পৌঁছে যেত যার ফলে মুসলমানদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ত আর অনেক সময় পরিস্থিতি অনেক স্পর্শকাতর হয়ে পড়ত আর কোন দুর্বল স্থানের সুযোগ নিয়ে কাফের বাহিনীর শহরে ঢুকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হয়ে যেত। মুসলমানরা সাধারণত তীর দ্বারা সেই সব আক্রমণকে প্রতিহত করত। কিন্তু অনেক সময় কাফের সেনারা মুসলমানদের উপর মুহূর্মুহ তীর বর্ষণ করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিত, আর অপরদিকে অন্য একটি দল আক্রমণ করে পরিখার কোন দুর্বল অংশে আক্রমণ করত এবং পরিখায় লাফিয়ে পড়ে সেটি পার করার চেষ্টা করত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনকি অনেক সময় রাতের কয়েক প্রহর পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলত।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫৮৫-৫৮৬)

ইতিহাসে এ বিষয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, একবার রসুলুল্লাহ্ (সা.) গাতফানের সঙ্গে সন্ধি করার বিষয়ে সাহাবাদেরকে, বিশেষ করে আনসারকে জিজ্ঞাসা করেন।

এই ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন- "এই দিনগুলি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট, উদ্বেগ ও বিপদের ছিল। অবরোধ যত দীর্ঘ হচ্ছিল,অনিবার্যভাবে মুসলমানদের প্রতিরোধের ক্ষমতা ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যদিও তাদের হৃদয় ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বস্তুজগতের নিয়ম-কানুনের অধীনে চলা শরীরগুলি ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছিল। আঁ হযরত (সা.) এই পরিস্থিতি দেখে আনসারদের নেতা সাআদ বিন মাআজ এবং সাআদ বিন উবাদাকে ডেকে তাঁদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করেন এবং এহেন পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ চান। সেই সঙ্গে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একথার উল্লেখও করেন যে, তোমরা চাইলে এটাও হতে পারে যে, বনু গাতফানকে মদিনা সংলগ্ন কিছু অংশ দেওয়ার বিনিময়ে এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া যায়। সাআদ বিন মাআয এবং সাআদ বিন উবাদা সমস্বরে বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আপনি যদি এ বিষয়ে কোনও ঐশী বাণী লাভ করে থাকেন, তবে আপনার আদেশ শিরোধার্য। সেক্ষেত্রে আপনি নিঃসন্দেহে সানন্দে এই প্রস্তাবানুসারে পদক্ষেপ করুন। " আঁ হযরত (সা.) বললেন, "না, না। এ বিষয়ে আমার কাছে কোনও ওহী আসে নি। আমি তো কেবল আপনাদের কষ্টার কথা চিন্তা করে পরামর্শ চাইছি মাত্র।" তাঁরা উভয়ে উত্তর দিলেন, "তবে আমাদের পরামর্শ হল, আমরা যখন শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কখনও কোন শত্রুকে কিছু দিই নি, তবে এখন মুসলমান হয়ে কেন দিব? আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাদেরকে তরবারি ধার ছাড়া কিছু দিব না।"

এখন তো যুদ্ধই বিকল্প। "যেহেতু আঁ হযরত (সা.) আনসারদের কারণেই উদ্বিগ্ন ছিলেন, যারা মদিনার প্রকৃত বাসিন্দা ছিলেন আর সম্ভবত এই পরামর্শের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে, আনসারদের মনের অবস্থা কি তা জ্ঞাত হওয়া। তিনি জানতে চাইছিলেন যে, তারা এই সব বিপদাপদের কারণে বিচলিত নয় তো? তারা উদ্বিগ্ন হলে তাদের মনোতুষ্টি করতে চাইছিলেন। এই জন্য তিনি (সা.) সানন্দে তাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন।" অর্থাৎ উভয় সাআদ-এর পরামর্শ। "আর যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫৮৯-৫৯০)

যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, পরিখা একটা সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর এর ভূমিকা পালন করলেও এর অর্থ মোটেই এই নয় যে মুসলমানেরা পুরোপুরি নিরাপদ ও শান্তিতে ছিল। প্রথমত মুনাফিক এবং বিশেষ করে বনু কুরায়যার ন্যায় যুদ্ধবাজ লোকেরা মদিনার অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল আর চুক্তি ভঙ্গ করার পর তারা এক ভয়ানক শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পক্ষান্তরে পরিখার থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি স্থান এমন ছিল যেখানে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল আর পরিখা ডিঙিয়ে শহরের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা ছিল। এমন উদ্বেগময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন স্থানে অবিরাম পাহারা দেওয়া হচ্ছিল আর সেই পাহারার কাজে স্বয়ং আঁহযরত (সা.) উপস্থিত থাকছিলেন। তিনি (সা.) তাদের তদারকি করছিলেন আর সাহাবাদের মনোবল বৃদ্ধি করছিলেন। দিনরাত এই কাজ অব্যাহত ছিল। সেই সময় মদিনায় রাত্রিতে ভীষণ শীত পড়ত। এর পাশাপাশি আরও অনেক সমস্যাবলী তো ছিলই।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) পরিখার ফাটলের অংশ পর্যন্ত পাহারা দিতে যেতেন। যখন তাঁর শীতে ভীষণ কষ্ট হত, তখন তিনি আমার কাছে আসতেন আর যখন তাঁর শরীর গরম হয়ে যেত, তখন তিনি পরিখার ফাটলের দিকে চলে যেতেন আর বলতেন, আমার আশঙ্কা হয় লোক এই দিক দিয়ে আসতে পারে। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর (সা.) সেইভাবেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি এতটাই ক্লান্ত ছিলেন যে, বললেন, কোনও পুণ্যবান যদি আজকের রাত এই জায়গায় পাহারা দিত! তিনি সেই কথাটি যখন বলছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি অস্ত্রের শব্দ শুনতে পান। রসুলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, কে? সাআদ বিন আবি

যুগ ইমামের বাণী

অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতঈন)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

ওয়াকাস বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ আমি সাআদ। আপনার নিরাপত্তায় প্রহরী হয়ে এসেছি। তিনি (সা.) বললেন, আমাকে পাহারা না দিয়ে অমুক স্থানে যাও। সেখানে পরিখার একটি অংশ দুর্বল, সেখানে পাহারা দাও। নবী করীম (সা.) -এর নিবেদিত প্রাণ সাহাবাদেরও তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিল বিস্ময়কর। তারা কিভাবে নিজেদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর সেবায় উৎসর্গ করতেন। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই নবী করীম (সা.) তাঁর নিজের প্রাণের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। তিনি এমন বীর পুরুষ ছিলেন যে নিজের প্রাণ নিয়ে বিচলিত থাকতেন না, তাঁর উদ্বেগ মদিনাবাসীদের নিয়ে। এর জন্য তিনি প্রায় সময় নিজে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থেকেছেন আর কখনও বিশ্রামের জন্য বাহ্যত শিবিরের মধ্যে গেলেও অধিকাংশ সময়ই তাঁকে খোদার দরবারে সিজদাবনত অবস্থায়, দোয়া করতে দেখা গিয়েছে।

যেমন হযরত উম্মে সালমা (রা.)বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে পরিখার যুদ্ধের সময় ছিলাম আর ভীষণ শীত ছিল। আমি এক রাত্রিতে দেখলাম, আঁ হযরত (সা.) দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁবুর ভিতরে তিনি নামায পড়লেন, যতটা আল্লা্ তা'লা চাইলেন। অর্থাৎ যতটা সম্ভব ছিল তিনি নামায পড়লেন। এরপর কিছুক্ষণ পর দেখলাম তিনি তাঁবুর বাইরে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম- 'মুশরিকদের এই অশ্বারোহীরা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। এরপর আব্বাদ বিন বিশর কে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সঙ্গে আর কি কেউ আছে? সে উত্তর দিল, জ্বী হাঁ। আমার সাথে কয়েকজন সঙ্গী আছে যারা আপনার শিবিরের আশপাশে পাহারা দিচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তোমার সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে পরিখার চারপাশে পাহারা দাও। মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পরিখার চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে। তারা তোমাদের অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করতে চাইছে।

তারা বলল, اَللّٰهُمَّ فَادْفَعْ عَنَّا شَرَّهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، وَاغْلِبْهُمْ، فَلَا يَغْلِبُهُمْ اَحَدٌ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ্! আমাদের থেকে তাদের অনিষ্ট দূর করে দাও আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর এবং তাদেরকে পরাস্ত কর। তুমি ছাড়া আর কেউ তাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আব্বাদ তাঁর সাথীদেরকে যখন নিয়ে গেলেন, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব সঙ্গীসহচর সহ পরিখার সংকীর্ণ স্থানের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। মুসলমানরা তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে তাদের দিকে পাথর ও তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে যার ফলে তারা নিজেদের স্থানে ফিরে যায়। অর্থাৎ শত্রুরা সেখান থেকে পিছু হটে। হযরত আব্বাদ বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। আমি তাঁকে সংবাদ দিলাম। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা আব্বাদ বিন বিশর-এর উপর কৃপা করুন। তিনি সকল সাহাবাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাঁবুর সঙ্গে বেশি সময় থাকতেন। সব সময় তাঁকে পাহারা দিতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বীরত্ব এবং মুসলমানদের জন্য তাঁর হিতৈষা এমন মার্গে উপনীত ছিল যে, তিনি শীতের রাত্রিতে উঠে এখানে পাহারা দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) পাহারা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আর শীতে কাবু হয়ে গেলে ঘরে ফিরে এসে কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে লেপের মধ্যে শুয়ে পড়তেন, কিন্তু শরীর গরম হলেই সেই ফাটলের সুরক্ষার জন্য চলে যেতেন।এভাবে পর পর রাত জাগার কারণে একদিন তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েন আর রাতের বেলায় বললেন, এই মুহূর্তে যদি কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান থাকত তবে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতাম। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে সাআদ বিন ওয়াকাসের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন, আপনাকে পাহারা দিতে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমাকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অমুক স্থানে পরিখার পাড় ভেঙ্গে দিয়েছে, সেখানে গিয়ে পাহারা দাও যাতে মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। নির্দেশমত সাআদ (রা.) সেই জায়গা পাহারা দিতে চলে যান আর আঁ হযরত (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন। (আশ্চর্যের বিষয় হল, এক স্থানে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, শুরুর দিকে যখন আঁ হযরত (সা.) মদিনায় এসেছিলেন আর বিপদ অনেক বেশি ছিল, তখনও সাআদ (রা.) পাহারা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন)।এই দিনগুলিতে একদিন তিনি (সা.) কিছু মানুষের অস্ত্রের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করেন ওখানে কে? তখন আব্বাদ বিন বশীর" হযরত মুসলেহ মওউদ আব্বাদ বিন বশীর লিখেছেন, কেননা তিনি আব্বাদ বিন বশীর বলেছেন-আনোয়ারুল উলুম-এর ২০ খণ্ডে এই নামটি আব্বাদ বিন বশীর নামেই লিপিবদ্ধ আছে, যেটি লেখার ভুল। যাইহোক আনোয়ারুল উলুমে এই বাক্যাংশ্যটি সীরাতুল হালবিয়া থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সীরাতুল হালবিয়ায় তাঁর নাম আব্বাদ বিন বিশর বর্ণিত হয়েছে। এই স্পষ্টীকরণটা এইজন্য দিচ্ছি যে, অনেকে পরে আমাকে লিখে পাঠাবে যে, অমুক স্থানে তো এমনটা লেখা ছিল, আপনি যেটা বলেছেন, সেটা এই। আসলটা কি? যাইহোক আসল নাম হল আব্বাদ বিন বিশর, যা হয়তো ভুলবশত আব্বাদ বিন বশীর লেখা হয়েছে। লেখার ভুল কিম্বা হযর ত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভুল করে এই নাম বলেছেন। যাইহোক, তিনি বলেন, আব্বাদ বিন বশীর বললেন, আমি। অর্থাৎ আব্বাদ বিন বিশর বললেন। তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, তোমার সঙ্গে কি আরও কেউ আছে? তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, সাহাবাদের একটি জ্যাত আছে, যারা আপনার তাঁবু পাহারা দিতে এসেছে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এই মুহূর্তে মুশরিকরা পরিখা পার করার চেষ্টা করছে, সেখানে যাও আর তাদেরকে প্রতিহত কর। আমার তাঁবুর কথা ভাবতে হবে না।"

(সূত্র: দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৯) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

এই যুদ্ধে হযরত সুফিয়া (রা.)-এর বীরত্বের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিবরণে লেখা আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর সহধর্মিণীগণ এবং ফুপু হযরত সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুতালিব (রা.) অন্যান্য মহিলাদের সাথে একটি দুর্গে অবস্থান করছিলেন, যে দুর্গটি ফারি নামে পরিচিত। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর সহধর্মিণীরা ও তাঁর ফুপু, তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য মহিলারাও সেই দুর্গে ছিলেন। হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.) সেখানে তত্ত্বধায়ক ছিলেন। বনু কুরায়যা যখন চুক্তিভঙ্গ করার ঘোষণা দিল, তখন সেখানে থাকা ইহুদীরাও কোনও না কোনওভাবে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আঁ হযরত (সা.)-এর ফুপু হযরত সুফিয়া বলেন, একবার দশজন ইহুদী আসে। তারা আমাদের দুর্গের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, যেন তারা এই সুযোগের সন্ধানে ছিল যে কখন এবং কোন পথে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এরই মাঝে একজন ইহুদী দুর্গের প্রাচীরের একেবারে কাছে চলে আসে। আমি তাকে লক্ষ্য করছিলাম। আমি হাসসানকে বললাম, হাস্সান! ওদিকে যাও, ঐ ইহুদীকে প্রতিহত কর। তখন সে বলল, হে আব্দুল মুতালিবের কন্যা! আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন যে, আমি এমন ব্যক্তি নই। আমার মাঝে সাহস থাকলে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে যেতাম। হযরত সুফিয়া (রা.)বলেন,যখন হাসসান একথা বলল, তখন আমি সেখান থেকে একটা কাঠের টুকরো নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে আসি আর যে ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছিল, কাঠটি দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করি। তারা মাথা ফেটে যায় আর সে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে। আমি ফিরে গিয়ে হাসসানকে বললাম, নীচে নেমে তার কাছে থাকা মালপত্রগুলো তো নিয়ে এস। অর্থাৎ তার কাছে যা কিছু আছে, সেগুলি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনিমত) হিসেবে তুমি নিয়ে এস। হাস্সান বলল, হে আব্দুল মুতালিবের কন্যা! তার মালপত্রের আমার প্রয়োজন নেই। আমি তখন বললাম, তার মুণ্ডু কেটে ইহুদীদের উপরই ফেলে দিয়ে এস, যাতে তারা ভীত হয় আর পুনরায় যেন এপথ না মাড়ায়। হযরত হাস্সান (রা.) বললেন, আমার মধ্যে এত সাহস নেই। তখন হযরত সুফিয়া তার মাথা কেটে ইহুদের দিকে ফেলে দেন। (তিনি নিজেই যান, সেই ব্যক্তির মাথা কেটে প্রাচীরের অপরপ্রান্তে ফেলে দেন) এর ফলে ইহুদীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা বলাবলি শুরু করল যে, আমরা জানতাম যে, মহম্মদ (সা.) মহিলাদের একা ফেলে রাখতে পারেন না, নিশ্চয় এদের সঙ্গে কোন প্রহরী আছে। এরপর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কানে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে হযরত সুফিয়ার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেন, যেমনটি পুরুষদের জন্য অংশ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২)

সীরাত খাতামান্নবীঈন গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন- "শহরে মহিলা ও শিশুদের এমন অবস্থা ছিল যে, আঁ হযরত (সা.) সচরাচর তাদেরকে শহরের একটি বিশেষ অংশে, যেটিকে দুর্গ বলা যাবে না, সেখানে একত্রিত করে রাখেন। কিন্তু তাদের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমানদের নিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না আর বিশেষ করে এমন সময় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ প্রবল রূপ ধারণ করছি, তখন মসলমান মহিলা ও শিশুরা প্রায় অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছিল আর তাদের নিরাপত্তার জন্য কেবল এমন পুরুষরা থেকে যেত, যারা কোন কারণবশত যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার যোগ্য নয়। এমনই এক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইহুদীরা শহরের সেই অংশে আক্রমণ করার প্রস্তাব যেখানে মহিলা ও শিশুরা একত্রিত ছিল। প্রথমে তারা গুপ্তচর হিসেবে একজনকে সেই মহল্লায় পাঠিয়ে দেয়।ঘটনাক্রমে সেই সময় মহিলাদের কাছে কেবল একজন সাহাবী কবি হাস্সান বিন সাবিত (রা.) উপস্থিত ছিলেন,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যিনি দুর্বল হৃদয়ের কারণে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন না। মহিলারা যখন সেই শত্রু ইহুদীকে নিজেদের বাসস্থানের আশপাশে এমন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখল,তখন আঁ হযরত (সা.)-এর ফুপু সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুতালিব হযরত হাস্সানকে বললেন,এই ব্যক্তি ইহুদী শত্রু। সে এখানে চরবৃত্তি ও কোন ক্ষতি করতে ঘোরাঘুরি করছে। তাকে হত্যা কর যাতে ফিরে গিয়ে সে কোন নৈরাজ্যের কারণ না হয়। কিন্তু হাসসানের সাহস হল না। ফলে হযরত সুফিয়া নিজেই এগিয়ে গিয়ে সেই ইহুদীর মোকাবেলা করেন এবং তাকে হত্যা করেন। এরপর তাঁরই প্রস্তাবে ঠিক করা হয় যে,এই ইহুদী চরের মাথা কেটে দুর্গের অপরদিকে ফেলে দেওয়া হবে,যেখানে ইহুদীরা একত্রিত ছিল, যাতে ইহুদীরা মুসলমান মহিলাদের উপর আক্রমণ করার সাহস না পায় আর তারা বুঝতে পারে যে, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য এখানে যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষ রয়েছে। এই পরিকল্পনা ফলপ্রসু হয়। ইহুদীরা ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন,প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, পৃ: ৫৯০-৫৯১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "বনু কুরায়যা ওৎ পেতে বসে ছিল যে, কোন সুযোগ পেলেই মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার পূর্বেই তারা মদিনায় ভিতরে ঢুকে মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে ফেলবে। একদিন বনু কুরায়যা এক গুপ্তচরকে পাঠায় যাতে তারা জানতে পারে যে, মহিলা ও শিশুরা একা আছে, নাকি যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান সৈন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত আছে। বংশের যে বিশেষ বিশেষ সদস্যদের শত্রুদের পক্ষ থেকে বেশি বিপদের আশঙ্কা ছিল, তারা এক বিশেষ বলয়ের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, সেই চর সেখানেই ঘোরাঘুরি শুরু করছিল আর চতুর্দিক লক্ষ্য করছিল যে, আশপাশে কোথাও মুসলমান সেনা লুকিয়ে নেই তো? সেই এই ধ্যানেই ছিল, ঠিক সেই সময় রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ফুপু হযরত সুফিয়া (রা.) তাকে দেখে ফেলেন। ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তে সেখানে কেবল একজন মুসলমান পুরুষ ছিলেন, আর তিনিও অসুস্থ ছিলেন। হযরত সুফিয়া (রা. তাঁকে বললেন, এই ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরে মহিলাদের চত্বরে ঘোরাঘুরি করছে, যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না, আর চতুর্দিকে সে দেখে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় সে একজন চর। তুমি তার মোকাবেলা কর, পাছে শত্রুরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানার পর এদিকে আক্রমণ করে বসে। সেই অসুস্থ সাহাবী এমনটি করতে অস্বীকার করেন। তখন হযরত সুফিয়া (রা.) নিজেই একটি বিরাট বাঁশ নিয়ে তার মোকাবেলা করেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সাহায্য নিয়ে তাকে মেরে ফেলতে সফল হন। অবশেষে তদন্ত করে জানা গেল যে, সেই ব্যক্তি ইহুদী ছিল এবং বনু কুরায়যার চর ছিল। তখন মুসলমানেরা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে আর মনে করে যে, মদিনার এই দিকটাও আর নিরাপদ নয়। কিন্তু সামনের দিক থেকে শত্রুরা এত বেশি চাপ তৈরী করছিল যে, এখন এদিকের নিরাপত্তার জন্য কোনও উপায় তারা করতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ্ (সা.) মহিলাদের নিরাপত্তাকে অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বারোশ সৈন্যদের মধ্য থেকে পাঁচশ সৈন্যকে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য শহরের মধ্যে নিযুক্ত করেন। অপরদিকে পরিখার নিরাপত্তার জন্য আঠারো-কুড়ি হাজার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে কেবল সাতশ সৈন্য অবশিষ্ট থাকে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড০-২০, পৃ: ২৭৪)

হযরত আলি (রা.) আমর বিন আব্দে উদ্দু আমিরিকে হত্যার ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিবরণ এইরূপ যে, কাফের বাহিনী যখন মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল, তখন তাদের নেতারা সম্মিলিতিভাবে আক্রমণ করার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছয়। তারা পরিখায় এমন কোনও সংকীর্ণ স্থান সন্ধান করতে শুরু করল,যেখানে তারা নিজেদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। অবশেষে তারা এমন একটি সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছল যেটি সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টি যায় নি। এরপর আকারামা বিন আবু জাহল, নওয়াফিল বিন আব্দল্লাহ্ এবং জিরার বিন খাত্তাব, হুবাইরাহ বিন আবু ওয়াহাব এবং আমর বিন আব্দে উদ্দ সেই স্থান দিয়ে পরিখার পার করে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমর বিন আব্দে উদ্দ এমন বীরযোদ্ধা ছিল যে, তাকে আরবে এক হাজার পুরুষের সমান বলে মনে করা হত। সে বদরের যুদ্ধে আহত হয়েছিল আর আহত থাকার কারণে উহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। সে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) যতদিন পর্যন্ত সে মহম্মদ (সা.)-কে হত্যা না করে, ততদিন সে মাথায় তেল দিবে না। সে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে ডাক ছাড়ল। পরিখা পার করে সেখানে এসে সে নারাধ্বনি উচ্চকিত করল, হাঁক ছাড়ল। মুসলমানদের প্ররোচিত করে বলল, হে জান্নাতের অভিলাষীরা! এস, আমি তোমাদের জান্নাতে পৌঁছে দিই, অথবা আমাকে তোমরা জাহান্নামে পাঠাও। যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ দাঁড়াল না, তখন হযরত আলী (রা.) দাঁড়াতে চাইলেন। তবে আঁ হযরত (সা.) তাঁকে একথা বলে বসিয়ে দিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমর বিন উদ্দ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যখন তৃতীয়বার আহ্বান করল, তখন হযরত আলী (রা.) উঠে দাঁড়ালেন।আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বাধা দিলেন না। অতঃপর আঁ হযরত (সা.)স্বয়ং নিজের পাগড়ি তাঁর মাথায় বেঁধে দিলেন এবং নিজের তরবারি তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং দোয়া করে তাঁকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রা.) এগিয়ে এসে আমরকে বললেন, আমি শুনেছি,তুমি অঙ্গীকার করে রেখেছ যে, যদি কুরায়েশদের মধ্য থেকে কোনও ব্যক্তি তোমর কাছে দুটি বিষয়ে আবেদন করে, তবে তুমি তার মধ্যে একটি আবেদন অবশ্যই মেনে নিবে। আমর বলল, হ্যাঁ। ঠিকই বলছ। হযরত আলী (রা.) বললেন, তবে আমি তোমাকে প্রথম কথা হিসেবে বলছি, তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং আঁ হযরত (সা.)কে গ্রহণ করে ঐশী নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হও। আমর বলল, এটা হতে পারে না। হযরত আলী (রা.) বললেন, যদি এটা মেনে না নাও, তবে এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। একথা শুনে আমর হাসতে শুরু করল। সে বলল, আমার ধারণা ছিল না যে, কেউ আমাকে এমন কথা বলতে পারে। এরপর সে হযরত আলীকে তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। হযরত আলী পরিচয় দিলে বললেন, তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিল। তাই তুমি চলে যাও, বড়দের মধ্যে কাউকে পাঠাও। হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি আমার রক্তপাত ঘটাতে চাও না, কিন্তু আমি তোমার রক্তপাত ঘটাতে কোন গড়িমসি করব না। একথা শুনে আমর ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ঘোড়া থেকে নীচে নেমে আসে এবং ঘোড়ার ক্ষুরের উপরের অংশ কেটে তাকে ধরাশায়ী করে দেয়। ঘোড়াটিকে মেরে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে এবং আগুনের ন্যায় তেজ নিয়ে হযরত আলীর দিকে অগ্রসর হয় এবং এমন শক্তি দিয়ে হযরত উপর তরবারি চালনা করে যে, তরবারী বর্ম ভেদ করে হযরত আলী (রা.)-এর কপালে গিয়ে ঠেকে এবং তিনি কিছুটা আহত হন। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত আলী (রা.) আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে এমন পাল্টাঘাত করলেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ নিজেকে রক্ষা করতে বেসামাল হয়ে পড়ল আর হযরত আলীর তরবারি তার কাঁধ কেটে নীচে নামিয়ে দিল। আমর নীচে ছটপট করতে করতে পড়ে গেল এবং মৃত্যু বরণ করল।

কতিপয় রেওয়াতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুটি বিষয় নয়, বরং তিনি বলেছিলেন, তিনটি কথা তুমি অবশ্যই মেনে নাও। প্রথম কথা ছিল তুমি ফিরে যাও। হযরত আলী (রা.) যখন তাকে বললেন, তখন তার মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, ফিরে যাও। যার উত্তরে সে বলেছিল এটা হতে পারে না। পরের কথাটি ছিল, মুসলমান হয়ে যাও আর তৃতীয় হল, তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমর নিহত হওয়ায় তার অন্য সঙ্গীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়ায় পড়ে পলায়ন করে। হযরত জুবায়ের (রা.) তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং নওফিল বিন আব্দুল্লাহকে হত্যা করেন। এইরূপে তাদের মধ্যে একজন এবং হুবায়ের বিন আবু ওয়াহাব (এই ব্যক্তি হযরত আলীর বোন উম্মেহানীর স্বামী ছিল)এর উপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করেন যে,ঘোড়ার পিঠের হাড় কেটে যায়। অপর এক রেওয়াত অনুসারে আমর নিহত হওয়ার পর হুবায়ের এবং জিরার বিন খাত্তাব হযরত আলীর উপর আক্রমণ করে, কিন্তু পাল্টা আক্রমণে তারা উভয়ে পলায়ন করে, এমনকি হুবাইরাহ নিজের বর্ম ফেলে পালিয়ে যায়। অথচ হুবাইরাহ কুরায়েশদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হিসেবে গণ্য হত।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে জিরার বিন খাত্তাব, যে হযরত উমর-এর ভাই ছিল, (সীরাত হালবিয়ায় জিরার বিন খাত্তাবকে হযরত উমর বিন খাত্তাব এর ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থকার এখানে ভুল করেছেন, এই ব্যক্তি উমর-এর ভাই ছিল না), যখন সে পলায়ন করল,তখন হযরত উমর (রা.) তাঁকে পিছু ধাওয়া করেন। জিরার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং হযরত উমর (রা.)কে বর্শা দ্বারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে বিরত হয় এবং আর আক্রমণ করে নি। হযরত উমর (রা.) কে সম্বোধন করে সে বলল, উমর! আমি তোমার উপর আক্রমণ করলাম না।আমার এই অনুগ্রহ স্মরণ রেখো। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ও সেই অনুগ্রহ নিশ্চয় স্মরণ রেখেছিলেন। জিরারের এই অনুগ্রহ, আল্লাহর অনুগ্রহেই হয়েছিল আর হয়তো উমরের সেই দোয়ারই এটা প্রভাব ছিল যে, মক্কা বিজয়ের সময় এই জিরারই ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর এরপর ইসলামী যুদ্ধসমূহে পূর্ণদ্যমে অংশগ্রহণ করেছিল এবং বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল এবং অবশেষে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। কারো কারো মতে তিনি শহীদ হন নি, বরং দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং মুসলমান হিসেবেই মৃত্যু বরণ করেন। আমর

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita, Bangaingaon (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-9 Thursday, 28 Nov-5 Dec 2024 Issue No.48-49

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর.....)

কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি সেগুলি সংগ্রহ করে রাখতে না পার, তবে সেগুলি পুড়িয়ে দাও বা শ্রেড করে দাও। এখানে শ্রেড পাওয়া যায়। প্রতিটি বাড়িতে শ্রেড থাকে না, তাই পুড়িয়ে দিও।

প্রশ্ন জামাতে আহমদীয়ার নাম কে রেখেছে এবং কিভাবে রেখেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই নাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রেখেছেন। ১৯০১ সালে যখন আদমশুমারি হয়। এখানে জার্মানীতে আদমশুমারিকে Volkszahlung বলা হয়। কোন দেশের জনসংখ্যা কত, তাতে পুরুষ ও মহিলাদের লিঙ্গ অনুপাত, শিশুদের সংখ্যা, কোন কোন ধর্মের মানুষ বাস করে ইত্যাদি তথ্য জানার জন্য সেদেশের সরকার আদমশুমারি করে থাকে। আর প্রতি দশ বছর অন্তর হয়ে থাকে। ১৯০১ সালে ভারতে যে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ জামাতের সদস্যদের বলেন, 'আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্রতা অর্জনের জন্য এবং নিজেদেরকে আহমদী তথা আহমদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছে, তোমরা নিজেদের নামের সঙ্গে আহমদী মুসলমান লিখো। এই আদমশুমারির যখন ফর্ম আসবে, তখন তাতে তোমরা আহমদী মুসলমান লিখো, যাতে বোঝা যায় যে আমরা আহমদী আর দেশের সরকারও জানতে পারে যে আমাদের সংখ্যা কত? এই কারণে আহমদী নাম রাখা হয়েছে আর সেটি রাখা হয়েছিল সেই যুগেই।

প্রশ্ন: প্রাচীন যুগে নবী কিভাবে জানতে পারতেন যে তিনি একজন নবী?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আধুনিক যুগে কিভাবে জানতে পারে?

কোন টেলিভিশনে ঘোষণা হয় কি? এমনটি তো কখনই হয় না। প্রশ্ন হল, যে যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটল, যাঁকে আঁ হযরত (সা.)নবী নামে অভিহিত করেছেন। আর তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু সে যুগে কোন টেলিভিশন বা রেডিও বা অন্য কোথাও কোনও ঘোষণা দেওয়া হয় নি। সংবাদপত্রের প্রচলন সেযুগে শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবী বলেছেন,আর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানতে শুরু করে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সংবাদ মাধ্যম ছিল না। এই কারণেই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সম্রাটের উদ্দেশ্যে এই মর্মে তবলীগি চিঠি লেখেন যে 'তোমাদের বিভিন্ন ধর্মের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শেষ শরিয়ত ধারী নবী আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আমিই সেই ব্যক্তি। তাই বিভিন্ন বাদশাহকে লেখা চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে তাঁর বার্তা পোঁছেছিল। এছাড়া যারা মুসলমান ছিল, সাহাবা ছিল, তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তবলীগ করতে গিয়ে বললেন যে নবী এসে গিয়েছে। অনেকে দাবি করে যে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয় নি। চীনের সঙ্গে আরবদের কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু চীনেও কোটি কোটি মুসলমান আছে। সেই যুগে সাহাবারা সেখানে গিয়েছিলেন, যারা সেখানে তবলীগ করেছেন আর এর ফলে চীনের বাসিন্দারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলমান হয়েছে। তাই এভাবে তবলীগ করে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, যে- নবীর আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) সমগ্র জগতের জন্য নবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আমি সমগ্র জগত তথা সমগ্র মানবতার জন্য নবী। সেই কারণেই তিনি সমগ্র জগতকে বার্তা দিয়েছেন আর পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী পোঁছেছে। পূর্বে যে সকল নবী আসতেন তারা নিজের নিজের এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। সীমিত এলাকার মধ্যে তাদের কাজ নির্ধারিত ছিল। যেমন- কোন জাতির এক বা দুই লক্ষ বা কোন একটি বিশেষ অঞ্চল- সেই এলাকার জন্য তারা নবী হতেন। একই সময়ে দুইজন নবীও হতেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর যুগে হযরত ইব্রাহিমও নবী ছিলেন, এর পাশাপাশি অন্য একটি এলাকা যেখানে হযরত লুত তাঁর জাতির জন্য (খোদার) বাণী নিয়ে এসেছিলেন। হযরত লুত (আ.)ও নবী ছিলেন। তাঁরা ছোট ছোট এলাকার জন্য নবী হতেন, নিজেদের এলাকার মানুষদের বলতেন যে তারা নবী, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঐশী বাণী সহকারে প্রেরণ করেছেন।

২য় খুতবার শেষাংশ....

বিন আব্দে উদ্দ নিহত হওয়ার পর কাফেররা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে এই বার্তা পাঠায় যে, তার মরদেহ তারা দশ হাজারা দিরহামের পরিবর্তে কিনে নিবে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, ওকে নিয়ে যাও তোমরা। আমরা মৃতদেহ কেনা বেচা করি না। কতিপয় রেওয়াত অনুসারে নওফিল বিন আব্দুল্লাহ্ অন্য সময় মারা যায়। এর বিবরণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন সে ঘোড়ায় চড়ে পরিখা পার হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘোড়া পরিখা পার করতে সক্ষম হয় নি এবং ঘোড়াসহ পরিখার মধ্যে পড়ে যায়, যার পরিণামে সে মৃত্যু বরণ করে। পরিখার পড়ে যাওয়ার ফলে তার ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ:৫৮৮-৫৮৯) (আলবাদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া,২য় খণ্ড, পৃ: ৪র্থ ভাগ, পৃ: ১১৫) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় ভাগ, পৃ:২৮৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৯২) (আসসীরাতুন নববীয়াহ লি আবিল হাসান নাদবি, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৫৩)

মুশরিকরা তার মরদেহ নিয়ে আসার জন্য নিজেদের প্রতিনিধি দল পাঠায় আর নবী করীম (সা.)কে বিনিময় মূল্য দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। আঁ হযরত (সা.) বলেন, আমাদের এই বিনিময় মূল্যের প্রয়োজন নেই। আমরা তোমাদেরকে ওকে দফন করার কাজে বাধা দিব না।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৮০)

হযরত মুসলেহ মওউদ(রা.) নওফিল এর নিহত হওয়ার ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

"যে শত্রুরা পরিখার উপর চড়াও হচ্ছিল, অনেক সময় তারা পরিখা অতিক্রম করতে সফল হত। যেমন একদিন কাফেরদে কয়েকজন প্রধান প্রধান সেনাপতি পরিখা পার করে অপর প্রান্তে চলে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু মুসলমানরা তাদের উপর এমন জোরালো আক্রমণ চালায় যে, ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। তৎক্ষণাৎ পরিখা পার করতে গিয়ে কাফেরদের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা নওফিল নিহত হয়। সে এত বড় একজন নেতা ছিল যে, কাফেরদের ধারণা মতে তার মৃতদেহের অবমাননা হলে আরবে তাদের মুখ দেখানো জায়গা থাকবে না। তাই তারা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে বার্তা পাঠায় যে, আপনি যদি তার মৃতদেহ আমাদের ফিরিয়ে দেন,তবে আমরা দশ হাজার দিরহাম আপনাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। তাদের ধারণা ছিল, যেভাবে আমরা মুসলমান নেতাদের, বিশেষ করে উহদের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর চাচার নাক ও কান কেটে ফেলেছিলাম, ঠিক তদ্রুপে মুসলমানরাও হয়তো আমাদের এই নেতার কান, নাক কেটে আমাদের জাতির অসম্মান করবে। কিন্তু ইসলামের বিধিনিষেধ একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। ইসলাম মরদেহের অসম্মান করার অনুমতি দেয় না। অতএব, কাফেরদের এই বার্তা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে পোঁছল, তিনি (সা.) বললেন-এই মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করব? এই মৃতদেহ আমাদের কি কাজে লাগবে যে, আমরা এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কোন মূল্য নিব? তোমাদের এই মৃতদেহ খুশি মনে তুলে নিয়ে যাও। একে নিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

যাইহোক এর বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

এই সপ্তাহ থেকে লাজনা ও আনসাদের ইজতেমা শুরু হচ্ছে। খুদ্দামদেরকে যেভাবে আমি বলেছিলাম, লাজনা ও আনসার উভয়কে আমি বলছি, এই দিনগুলিতে বিশেষভাবে দোয়ার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করুন, দরুদ পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন এবং ইজতেমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা চেষ্টা করুন। দিনগুলি যেন বিনোদন ও খোশগল্পের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা ইজতেমাকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

(সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৪)

যুগ খলীফার বাণী

মোমেনদের জন্য নিজেদের আনুগত্যের মান ক্রমশ উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। (খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir